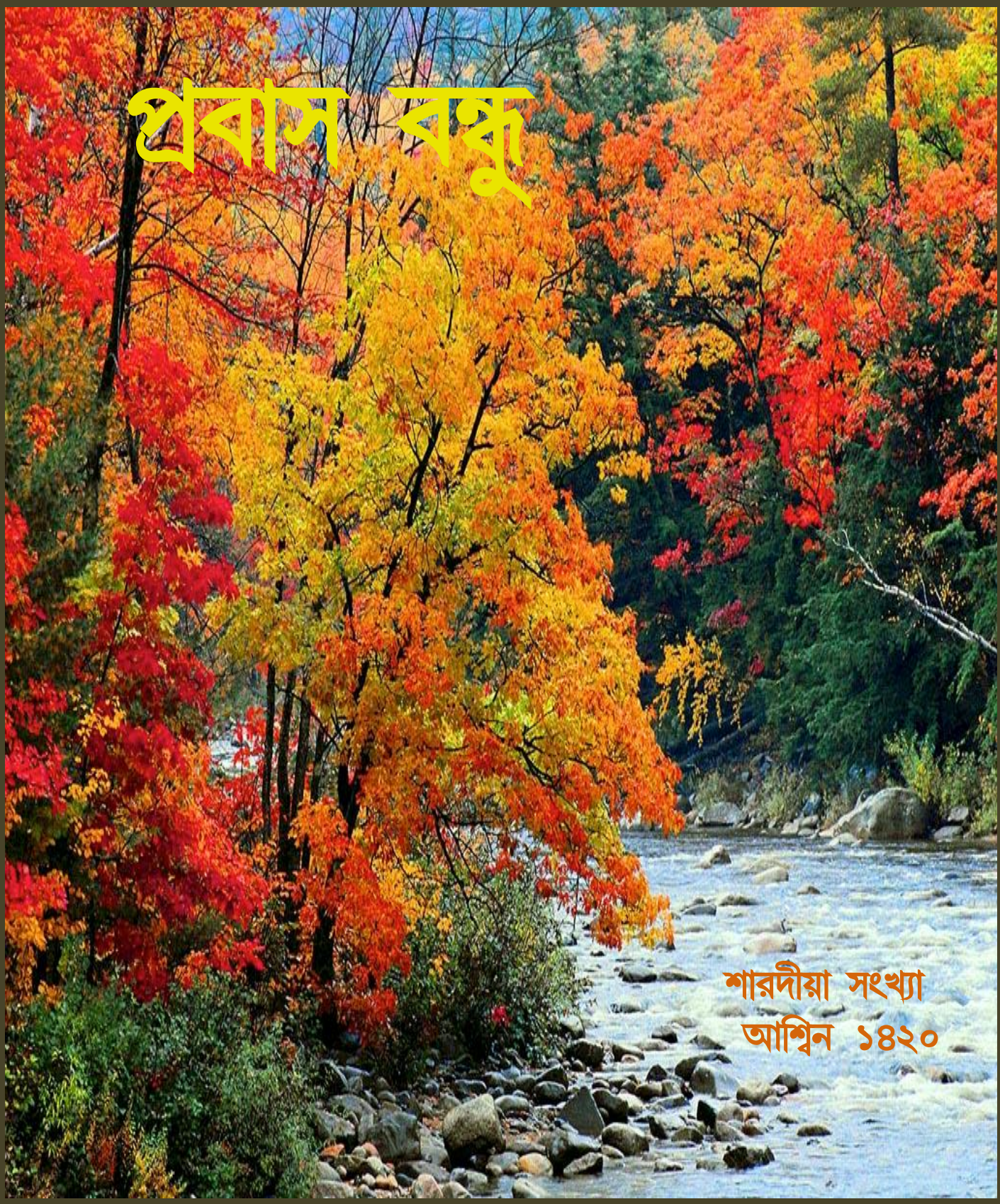
প্রবাস বন্ধু
শারদীয়া সংখ্যা
আশ্বিন ১৪২০

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২০, অক্টোবর ২০১৩

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস) ৩

গদ্য

গীতাঞ্জলি- তাহাদের ও আমাদের দৃষ্টিতে	অসিত কুমার সেন (অস্টিন, টেক্সাস)	৫
একটি না-বক্তৃক ভাষণ	ফণিন্দ্রমোহন দাস (কলেজ স্টেশন, টেক্সাস)	৯
স্মৃতি তর্পণ- আমার ছেলেবেলার মহালয়া	জয়া ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	১৪
সম্পর্ক	জয়শ্রী বাগচী (নিউ দিল্লী, ইন্ডিয়া)	১৬
কী করে আশাবাদী হওয়া যায়	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	১৯
চার বুড়ো	নন্দিতা ভাটনগর (অটোয়া, ক্যানাডা)	২০
ভদ্রলোক	প্রভাত কুমার হাজরা (মেলরোজ, ম্যাসাচুসেট্স্)	২১
নোনাজলের পদ্মদীঘি	এস. এস. নেওয়াজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	২৪
আমি জননী, আমি তনয়া- আমি শকুন্তলা...	সুমিতা বসু (বেঙ্গালুরু, ইন্ডিয়া)	২৮
আমার কলকাতা আমার হিউস্টন	অপর্ণা দত্ত (হিউস্টন, টেক্সাস)	৩০
সুপার মায়ের ডুপার দৌড়	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	৩১
টক ঝাল মিষ্টি	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	৩২
ধ্রুবতারা	শুক্তি দত্ত (হিউস্টন, টেক্সাস)	৩৪
সুন্দরী	গীতাঞ্জলি ভট্টাচার্য্য বঙ্গ (কলকাতা, ইন্ডিয়া)	৩৬
ছবি	পুষ্পা সাক্সেনা (সিয়্যাট্ল্, ওয়াশিংটন্) অনুবাদ: সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহাইও)	৩৮

কবিতা

কবির পাঠিকা	শেলী শাহাবুদ্দিন (ক্যালিফোর্ণিয়া)	১২
স্বপ্নের কুঁড়েঘরে	দেবাশিস মজুমদার (ম্যান্চেস্টার, নিউ হ্যাম্পশায়ার)	১২
কল্লোলিনী কলকাতা	ডলি ব্যানার্জী (কলকাতা, ইন্ডিয়া)	১৩
যোগসূত্র	মুকুল ঘোষহাজরা (স্যালাইনা, ক্যান্সাস্)	১৩
এক একটা দিন	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	১৫
মনে আছে মনে পড়ে না	অপর্ণা দত্ত (হিউস্টন, টেক্সাস)	১৮
পথভ্রান্ত	মালবিকা সেনগুপ্ত (হিউস্টন, টেক্সাস)	১৮
কেউ চায় কেউ চায় না	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	২০
প্রতিবাদ	সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	২২
মাঝি	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	২২
স্বপ্নবিলাস	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহাইও)	২৩
অন্তরতম	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	২৩
আলো	সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	২৭
হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ	দীপক বাগচী (অন্টারিও, ক্যালিফোর্ণিয়া)	২৭
রবিবার	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	৩২
এ এক আশ্চর্য কুসুম- তবু...	গীতাঞ্জলি ভট্টাচার্য্য বঙ্গ (কলকাতা, ইন্ডিয়া)	৩৩
সাক্ষী	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহাইও)	৩৫
মানুষ বাঙ্গালী	শেলী শাহাবুদ্দিন (ক্যালিফোর্ণিয়া)	৩৫
চলাচল	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস)	৩৭

অঙ্কন

বিনীতা	২
অনির্বাণ ঘোষ (কলকাতা, ইন্ডিয়া)	৪
অনির্বাণ ঘোষ (কলকাতা, ইন্ডিয়া)	৪

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২০

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু সভ্যবৃন্দ

সহযোগিতায়:

রূপছন্দা ঘোষ
মালবিকা সেনগুপ্ত
তৃষা বিশ্বাস
চন্দ্রা দে
ভজেন্দ্র বর্মন
অসিত কুমার সেন

মুদ্রণ ব্যবস্থায়:

মৃণাল চৌধুরী
শুভেন্দু চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ:

আমেরিকার হেমন্তকাল

সম্পাদনায়:

সুজয় দত্ত
মালবিকা চ্যাটার্জী

শিল্পী বিনীতা

সম্পাদকীয়

আমরা যখন নিজেদের মধ্যে সাহিত্য চর্চা করি, তখন আমাদের পূর্বসূরীদের সর্বদা স্মরণে রাখি। বাংলার নব জাগরণের (রেনেসাঁ) যুগে এমন অনেক সাহিত্যিক, গীতিকার, নাট্যকার, কবির প্রাধান্য ছিল যাঁরা সাহিত্য জগতে একে অপরের পরিপূরক। কেউ যদি সেই যুগে বাংলা সাহিত্যের দরবারে প্রাবন্ধিক, তো অন্য একজন কবি, গীতিকবি, কেউ নাট্যকার, কেউ বা ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অবশ্য তাঁরা সকলেই বহুমুখী প্রতিভার নজির রেখে গেছেন। তেমনই একজন সাহিত্যিক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যাঁর রচনার সমৃদ্ধি বহুজনবিদিত। তিনি একাধারে কবিতা, গান, নাটক, রম্য, ব্যঙ্গ- সবরকম রচনাই করেছেন। তাঁর রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকগুলি আর অতি অবশ্যই দেশাত্মবোধক গানগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং সেই দেশাত্মবোধক গানগুলি এখনও বাঙালির মনে শিহরণ জাগায় এবং দেশাত্মবোধের উদ্রেক করে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সবথেকে জনপ্রিয় রচনা-

‘ধনধান্যপুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক-
সকল দেশের সেরা;
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে ’দেশ
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে-
আমার জন্মভূমি।’

এই গানের জুড়ি মেলা ভার! বাঙালির মনে দেশমাতৃকার প্রতি প্রাণের গহন থেকে নিঃশেষিত ভালবাসার অনুভূতি বের করে এনেছিলেন তিনি এই গানটি রচনা করে। জন্মভূমিকে কে না ভালবাসে! কিন্তু এমন বিগলিত হয়ে মাতৃভূমির বন্দনা এত সহজ ভাষায় কে বা পারে করতে!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩ সালের ১৯শে জুলাই কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট্ স্কুল থেকে এনট্র্যান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। তারপর ১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংলিশে এম.এ পাস করে স্টেট্ স্কলারশিপ্ নিয়ে ইংল্যান্ডে কৃষিবিদ্যা অর্জন করতে যান। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি কিছু ইংরেজি কবিতাও রচনা করেন। বিদেশে পড়া শেষে এগ্রিকাল্চারের খেতাব নিয়ে তিনি ১৮৮৬ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৮৮৭ সালে সুরবালা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৮৮৬ সালে তিনি ডেপুটি মেজিস্ট্রেট্ হয়ে সরকারি কাজে যোগ দেন। সেই থেকে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, বিহারের নানান জায়গায় কর্ম-জীবন কাটিয়ে ১৯১২ সালে তাঁর কর্মক্ষেত্রে বদলি হন মুঙ্গেরে। সেখানে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কর্মে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তার দু-মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ‘আমরা এমনি এসে ভেসে যাই’- তিনিও এমনি এসে জীবনতরীতে ভাসতে ভাসতে ১৯১৩ সালের ১৭ই মে, ৪৯ বছর বয়সে ভবসাগর পার করে বহু দূরে চলে যান।

এই বছর তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্তিতে পাঠচক্রের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

আমাকে যাঁরা অহরহ পত্রিকার কাজে সাহায্য করেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।
ধন্যবাদ জানাই আমাদের পত্রিকার স্বতঃস্ফূর্ত লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের।

শারদীয়া অভিনন্দন জানাই আমাদের পাঠক/পাঠিকাদের।

মালবিকা চ্যাটার্জী

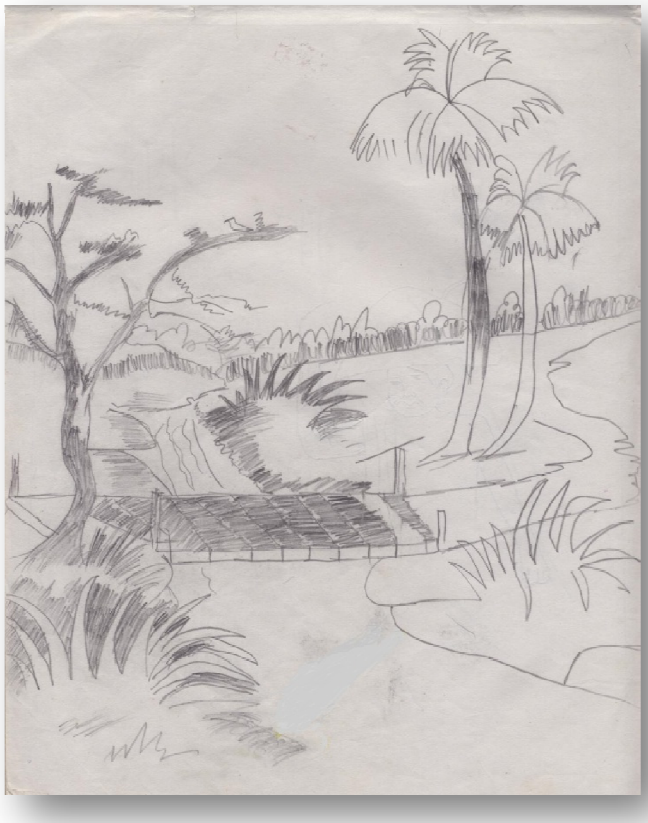

শিল্পী অনির্বাণ ঘোষ

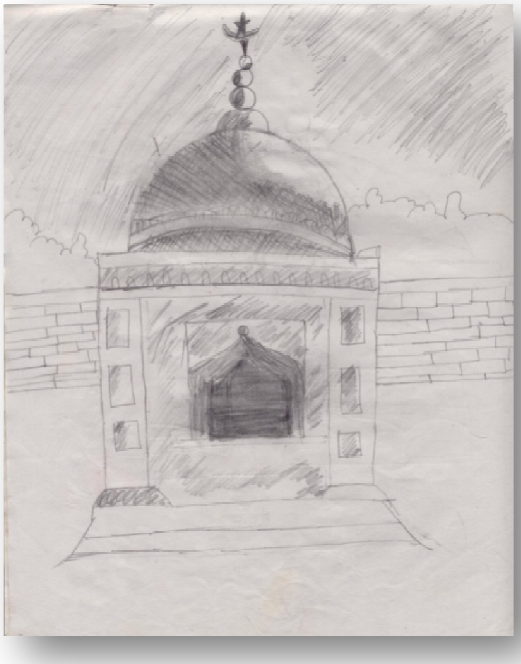

গীতাঞ্জলি- তাহাদের ও আমাদের দৃষ্টিতে

অসিত কুমার সেন

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি একশ বছরের কিছু আগের রচনা। গ্রন্থটিতে কবির জাগতিক অভিজ্ঞতা, ধ্যানগভীরতা, সর্বোপরি ভাষার স্বচ্ছতা ও সরলতা কবিতা ও গানে পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে কবিমানসের যেমন এক ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সেইরূপ বিভিন্ন ধারা নতুন ফসলেরও সন্ধান মেলে। গীতাঞ্জলির পূর্বে লিখিত কাব্যগুলিতে- যেমন 'সোনার তরী' (১৮৯২-১৮৯৩), 'চিত্রা' (১৮৯২-১৮৯৫), 'চৈতালী' (১৮৯৫-১৮৯৬), 'কল্পনা' (১৯০০), সাধারণতঃ প্রকৃতির রূপ, নরনারীর প্রেম বা সামাজিক ও ব্যক্তিগত ভাবনা ধরা দিয়েছে- তেমনি বিশেষতঃ গীতাঞ্জলি (১৯০৬-১৯১০), গীতিমাল্য ও গীতালি (১৯১১-১৯১৪) কাব্যে ভক্তিরসের বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক এক সাহিত্য সমালোচকের ভাষায় গীতাঞ্জলি এক ভরা সরোবরের কাব্য, যেখানে ভক্ত হৃদয়ের প্রেম নিবেদন আপনাকে যেন উজাড় করে বিরাজমান। গ্রন্থটির কবিতাগুলি কবির নিজস্ব অনুবাদে ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে। পরে সে দেশে এবং তারপরে ইউরোপে, মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজে একটা সাড়া পড়ে যায়। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে তিনি বহু সময় বিদেশে কাটান। তার কারণ কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে ভাব, শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতির আদানপ্রদানে আজীবন বিশ্বাসী ও কর্মরত ছিলেন। এই বিষয়ে তিনি ভারতের এক অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে গেছেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় তিনি একাধিকবার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গেছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষা ও কৃষিকর্মের পদ্ধতির প্রচার ও সে কাজে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের দ্বারা অনেক সময় সাহায্য ও অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রে তিনি ভারতের প্রতিবেশী চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও পারস্য-দেশগুলির সঙ্গে ভাব ও তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য সেসব দেশের জ্ঞানীদের অতিথি হয়েছেন। আমরা গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে যে সময়ের কথা উল্লেখ করছি সেটা ১৯১২ সালে তাঁর ইংল্যান্ড যাত্রার অব্যবহিত পূর্বকার যুগ। সেই সময় কতকগুলি ঘটনা সমন্বয় তাঁকে বিদেশ যাত্রার জন্য উন্মুখ করে তোলে। ১৯০৩ থেকে ১৯০৭ অবধি তাঁর প্রধান চিন্তাধারা ও কার্যক্ষেত্র স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। সেই সময়, কবির মতে দেশে শিক্ষাভিত্তিক কর্মসূচী অনুসারে সমাজ সংগঠনের কাল। কিন্তু ভারতীয় এবং বঙ্গীয় আন্দোলনের নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথমে গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন জানায় এবং বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে গণ-আন্দোলনের পথ অবলম্বন করেন। সেই আন্দোলনের কর্মসূচী রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন না এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে বিমুখ হ'ন। আন্দোলনে অংশগ্রহণে অক্ষমতার প্রতিক্রিয়া তাঁর মন চিন্তান্বিত ও ক্ষুব্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত, বঙ্গ সমাজে এক শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায় কিছু সময় যাবৎ কবির কাব্যের এবং গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু, শব্দপ্রয়োগ, বা রচনাশৈলী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন- 'ভাঙা ভাঙা ছন্দ, আধ আধ ভাষার কবি'- (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)। সংবাদপত্রে, লোকসভায়, কবির প্রতি বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধ সমালোচনা খুব সম্ভব তাঁর মনে বিষাদের ছায়া ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল। সর্বোপরি, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা কবির মনকে ব্যথিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সর্ব প্রথম কবিজায়া মৃণালিনী দেবী (১৯০২), তারপর কন্যা রেণুকা (১৯০৩), শ্রদ্ধেয় পিতা দেবেন্দ্রনাথ (১৯০৫), ও শেষে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৯০৭) ইহলোক ত্যাগ করেন। শৈশবে মাতৃহারা কবি যৌবনে তাঁর অন্তরঙ্গ সাথী ভ্রাতৃজায়া কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক আজীবন মনে বহন করে গেছেন ও কাব্যে প্রকাশ করেছেন। সাংসারিক দুঃখ, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপথ অবলম্বন এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে পরিণতির চিন্তা ও অস্থিরতা কবির মন বহির্মুখী করবার যথেষ্ট কারণ হিসাবে ধরে যায়। সে সময় কবির মন বহির্মুখী হওয়ার কারণ সম্বন্ধে সমাজ সমালোচক নীরদ চৌধুরীর মন্তব্য দ্রষ্টব্য- Datta & Robinson. Preface: Page 9. ১৯০৬/১৯০৭ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রমানসে আধ্যাত্মিকতার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন গীতাঞ্জলি ও সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থগুলিতে অন্তত 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া'য় সেই ভাবধারা অনুধাবন করা খুব কঠিন নয়।

অবশেষে ১৯১২ সালের জুন মাসে কবি, সপত্নীক রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর এক বন্ধু জলপথে ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছান। লন্ডনের পাতাল রেলে হোটেলে যাবার সময় এক বিপত্তি ঘটেছিল। হোটেলে গিয়ে দেখা গেল গীতাঞ্জলি অনুবাদের পান্ডুলিপিবাহী স্যুটকেস্‌টি নিখোঁজ। উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে অনুসন্ধান শুরু হ'ল এবং ভাগ্যক্রমে অথবা ইংরেজ রেল কর্মচারীদের তৎপরতায় স্যুটকেস্‌টি শীঘ্রই রেলের হারানো/প্রাপ্তি রক্ষণাগার থেকে উদ্ধার করা যায়। কবি উত্তর লন্ডনে William Rothenstein-এর আমন্ত্রনে সদলে তাঁর অতিথি হন। নিজস্ব অনুবাদে গীতাঞ্জলির কবিতাগুলি সম্পর্কে Rothenstein-এর মতামত জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সেগুলি কবি তাঁর হাতে দেন। Rothenstein ইংল্যান্ডে কেবল চিত্রশিল্পী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না, তিনি লন্ডন ও প্যারিসের চারুশিল্প শিক্ষালয়ের (Slade School এবং Academie Julian) কৃতী ছাত্র। ফ্রান্সের impressionism/উত্তর impressionism ঘরানার চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। Camille Pissarro, Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec এবং ইংল্যান্ডে সাহিত্যিক Oscar Wilde, Roger Fry প্রমুখ যশস্বী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। সাহিত্য বোদ্ধা Rothenstein-এর নাম ইংল্যান্ডে সুবিদিত ছিল। ১৯১১ সালে Rothenstein অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে যখন একবার কলকাতায় আসেন, সেইসময় জোড়াসাঁকোয় তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। ইংল্যান্ডে কবির আগমন সম্ভাবনা আছে জানতে পেরে Rothenstein কবিকে লন্ডনে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান।

লন্ডনে Rothenstein কবির কবিতাগুলি আগ্রহের সঙ্গে পড়েন এবং তার ভাবগভীরতা ও উৎকর্ষতা উপলব্ধি করে কবিতাগুলির অনুলিপি তৈরী করেন। পরে সেগুলি পরিচিত কবি, লেখক ও সাহিত্য সমালোচকদের হাতে পৌছাবার ব্যবস্থা করেন। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ/পরিচয় করাবার উদ্দেশ্যে Rothenstein সেই সময় একটি হোটেলে সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেন। সেই ভোজনসভায় Rothenstein অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ইংল্যান্ডের রাজকবি Robert Bridges, ফরাসী কবি ও কূটনীতিবিদ St. John Perse, মার্কিন কবি Ezra Pound, আয়ারল্যান্ডের কবি William Yeats, কবি-নাট্যকার-সাহিত্য সমালোচক Thomas Sturge Moore, সাহিত্যিক Herbert G. Wells প্রমুখ গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ করান। এইসূত্রে কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকজনের নিকট সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হন এবং তাঁর কবিতা ও কাব্যসাহিত্য বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পান। তৎকালীন ইংল্যান্ডে একাধিক সাহিত্যসেবীদের নিকট সংস্পর্শে আসবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ কবির পক্ষে অত্যন্ত সুফলদায়ক হয়েছিল। Rothenstein-এর উদ্দেশ্য ছিল গীতাঞ্জলি রচয়িতার সঙ্গে বৃহত্তর সাহিত্য-মন্ডলীর পরিচয় করানো। কবির সুহৃদ হিসাবে ও শিল্পীর দায়িত্ব পালনের কর্তব্যবোধে Rothenstein সেই কাজ করার সংকল্প করেন। কবির প্রতিভার প্রচার Rothenstein সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেন। বস্তুত, ইংল্যান্ডের সাহিত্য জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ গোড়া থেকেই Rothenstein-এর উৎসাহে ও মাধ্যমেই ঘটে। তাঁরই উদ্যোগে কবি Yeats সাহিত্য জগতের সম্মুখে গীতাঞ্জলি উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। Mary Lago এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, ' William Rothenstein wrote to MacMillan Co. to publish Gitanjali and other translations as a mover of a career that brought Tagore wealth and fame and set the pattern for modern literary exchange between India and the West.' (Preface to William Rothenstein's Men and Memories. 1978. Page 18).

সাহিত্য জগতের দুই মনীষীর সঙ্গে আলোচনার বিবরণ কবি এই সময় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দুজনেই সাহিত্য বোদ্ধা ও আয়ারল্যান্ডের বংশোদ্ভূত এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বের ইংরেজী সাহিত্য জগতের প্রাণকেন্দ্র লন্ডনের অধিবাসী। Stopford Brooke প্রথম কর্মজীবনে Church of England-এ যাজক ও পরে সম্রাজ্ঞী Victoria-র ধর্মোপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ধর্মের ব্যাখ্যান ও তার গোঁড়া নিয়মাবলীতে বিশ্বাস হারান এবং ধর্ম বিষয়ে নিজস্ব মতবাদ বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার শুরু করেন। তাঁর সাহিত্যে অনুরাগ এবং চারুকলা সম্পর্কে জ্ঞান সুবিদিত ছিল। Stopford Brooke-এর সঙ্গে আলাপ করে কবি ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জগতে মানুষের মনে খ্রীষ্টধর্মের ক্রমক্ষীয়মান প্রভাবের এক প্রধান কারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও নিয়মাবলী যখন জীবনে শাসক হয়ে দেখা দেয় তখনই সেই সমাজের মানুষ জড়ত্ব পরিহার করতে ব্যগ্র হয়। কবির ভাষায়- 'আমি এইটে বুঝিলাম যে খ্রীষ্টধর্মের বাহ্য কাঠামোতে (creed) বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে---। এদেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমুখ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ ধর্মের এই আয়তনটা।' মৃত্যুর কিছু পূর্বে Stopford Brooke গীতাঞ্জলি কাব্যের প্রয়োজনীয়তা এইভাবে উল্লেখ করেন: 'তোমার এই কবিতাগুলিতে creed-এর কোন গন্ধ নাই। ইহাতে আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।'- (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ খন্ড, ৯১৬ পৃষ্ঠা)। খ্রীষ্টধর্মের এই বোদ্ধার মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধার্য করা যায়।

গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে Yeats-এর মন্তব্য উল্লেখ করার প্রয়োজন এই কারণে যে Yeats তৎকালীন ইংরেজী সাহিত্য জগতের এক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি। গীতাঞ্জলি অনুবাদের খাতাটি Yeats-এর হাতে পৌছায়। তখনকার ইংল্যান্ডের কাব্য সাহিত্যের একটা আড়ষ্টভাব ও রসের অভাব কবির চোখে পড়ে। তাঁর ভাষায় 'কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজন বোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে তখন তাহার কারুকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে। আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না,--- কবি যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে কোন কাব্য লেখেন সেখানে তাঁহার লেখা গাছের ফুল ফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়... [য়েট্স্] নিজের চিত্তের অবারিত স্পর্শশক্তি দিয়া জগৎকে গ্রহণ করিতেছেন। কবি ভাবের আলোকে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ সেই দেশের হৃদয়ের রঙ দিয়া তাহাকে একটু বিশেষভাবে প্রকাশ করেন।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ খন্ড, ৯০৯ পৃষ্ঠা)। Yeats কবির অনুদিত কবিতাগুলি সম্পাদনার ভার সানন্দে নেন, কিন্তু ভাষার রদবদলের পরিবর্তে যতিচিহ্ন জাতীয় প্রয়োগে কিছু সংশোধন করেন। মূল কবিতাগুলির কোন অংশের পরিবর্তনের প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না, একথা তিনি Rothenstein-কে জানান- 'I don't want anything crossed out by Tagore's modesty.' (William Rothenstein: Men and Memories, Page 166). তিনি নিজেই গীতাঞ্জলির ভূমিকা লেখার দায়িত্ব নেন। সেখানে তিনি তাঁর মন্তব্যে বলেন- তিনি যখন লন্ডনের ট্রেনে, বাসে বা রেস্তোরাঁয় বসে কবিতাগুলি পড়েছেন, তখন অনেক সময়ই গ্রন্থপাঠ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন যাতে তাঁর ভাবাবেগের বাহ্য প্রকাশ লোকে দেখতে না পায়। Yeats শুধু যে গীতাঞ্জলির ভাব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন তা নয়, কবির কাব্য মানসকেও তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করেন। গীতাঞ্জলি ইউরোপের তৎকালীন এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, Andre Gide-এর দৃষ্টিও একইভাবে আকর্ষণ করে। ১৯১৩ সালের মার্চ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বইটির চাহিদা মেটাতে প্রকাশক MacMillan Co.কে গ্রান্থটি ১০ বার মুদ্রণ করতে হয়। ভাবের সমতা ও উপযোগী নৈবেদ্য ও খেয়ার কিছু কবিতার অনুবাদও গীতাঞ্জলির সঙ্গে একত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে Yeats-এর বন্ধু Thomas Sturge Moore-এর প্রথম সান্ধ্য ভোজনের পরে আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ ও ভাব বিনিময় হয়। Thomas Sturge Moore একাধারে কবি ও নাট্যকার এবং কাব্য সমালোচক। তিনি কবির অন্য কিছু কবিতার

অনুবাদে সহায়তা করেন। Thomas Sturge Moore-এর উৎসাহে ও তাঁর সুপারিশে গীতাঞ্জলি Nobel Committee-র কাছে পৌঁছায়। সাহিত্যের মূল্যায়নে কমিটির সেই সময় মানদন্ড ছিল a lofty and sound idealism- উচ্চস্তরের ও কার্যোপযুক্ত আদর্শবাদ। কমিটির সভ্যদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত গীতাঞ্জলি ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা উপযোগী গ্রন্থ হিসাবে নির্বাচিত হয়। মূল গীতাঞ্জলির ভাবের জগত সম্পর্কে বাঙালি পাঠক কমবেশী পরিচিত। সেই সঙ্গে কবির ইংরেজী অনুবাদ পড়লে বোঝা যায় ভাবের প্রকাশ কতদূর মূল গ্রন্থের অনুগমন করেছে। অন্যান্য ভাষায়ও ঈশ্বর প্রেম ও ভক্তিরসের কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। Dante-র Divine Comedy পাশ্চাত্য সাহিত্যে এক প্রধান কাব্যগ্রন্থ- পরে সেই গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মযাজক, Meister Eckehart Von der Geburt der Seele বা আত্মার উৎপত্তির রচয়িতা। তাঁর বিভিন্ন লেখায় আত্মার সঙ্গে ভগবৎ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গীতাঞ্জলির বিষয়ে আমাদের বিস্ময়ের কারণ, অনাড়ম্বর রচনাশৈলীর সহজবোধ্য ভাষায় ভক্ত হৃদয়ের এহেন প্রেম নিবেদন সাহিত্যে সম্ভবত এই প্রথম। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, চন্ডীদাসের কাব্যে ভক্ত হৃদয়ের আকুতি ও প্রেমের সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রকাব্যেও তার প্রভাব অনুধাবন করা যায়। তবুও গীতাঞ্জলি কাব্যে প্রেমের রসটুকু রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরম পুরুষের পায়ে সমর্পণ করেন একান্ত নিজস্বভাবে। গীতাঞ্জলি কাব্যে প্রেমের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভাব প্রকাশ ভাষায় ও ভঙ্গিতে। ভক্ত হৃদয়ের প্রেম পার্থিব প্রেম অপেক্ষা এক ভিন্ন প্রেমের সন্ধান দেয়।

গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে অনেকেরই ধারণা আছে। তবুও সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তবে ভক্তিরসের যে অর্ঘ্য বাঙালি পাঠকের হৃদয় আলোড়িত করে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ইউরোপেও সেই ভক্তিরস খ্রীষ্টধর্মাশ্রয়ী মানুষ মানবিকতায় বিশ্বাসী বা নিছক কাব্য রসিকের হৃদয়েও অনুরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ ইংল্যান্ড প্রবাসী মার্কিন কবি Ezra Pound বলেছেন- 'I have nothing but pity for the reader, who is unable to see that their piety is the poetic piety of Dante and it is very beautiful.' Pound এখানে Divine Comedy কাব্যের প্রণেতা Alighieri Dante-র ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর অন্বেষণে ভক্তিরসের সঙ্গে গীতাঞ্জলির কবির ভক্তিরসের তুলনা করেছেন। তাঁর মতে কাব্যরস নিরীক্ষায় গীতাঞ্জলি সার্থক ও অতি সুন্দর ভক্তিকাব্য। ইংল্যান্ডের Times পত্রিকার Literary Supplement-এর সাহিত্য সমালোচক অনুরূপ মন্তব্যে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর ভাবনার অংশীদার না হয়েও বোঝা যায় যে তিনি নিজের বিশ্বাসে নির্ভর করে ঈশ্বর উপলব্ধি করেছেন।

অপরপক্ষে, ইংরেজী সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রের বিস্তার এবং সাহিত্য জগতে সমালোচকদের তৎপরতার প্রচলন কবির চোখে পড়ে। তৎকালীন সাহিত্য জগতকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাহিত্যসেবী, আপনাদের জীবনে চিন্তাধারার পারস্পরিক লেনদেন সর্বদাই সমালোচনার তীব্র আলোয় সমাজের চোখে পড়ে। সেই কারণে আপনাদের সমাজ জীবনে উৎকর্ষতা স্থান পায়। অথচ আমরা দেশে নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র গন্ডীর মধ্যে জীবন যাপন করি। এক গোষ্ঠীর কার্যকলাপ ও বিচার বিবেচনা অন্যেরা বরদাস্ত করে না। সেই কারণে আমাদের সামাজিক উৎকর্ষতার মানদন্ড নীচু।' (William Rothenstein: Men and Memories, page 169). এই মন্তব্যের বিশেষ মূল্য এই যে উত্তম সাহিত্য সৃষ্টিতেও যে দোষ গুণ দুই উপসর্গেরই অবকাশ আছে সে কথা সাধারণ পাঠকের সর্বদা স্মরণে থাকে না। সাহিত্যে নির্ভীক মত প্রকাশের দৃষ্টিতেই তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হয়। গুণী সমালোচকদের একটি শিরঃপীড়ার কারণ হ'ল sentimentalism বা অন্ধ আবেগের উচ্ছ্বাস। (William Rothenstein: Schwaermerai, Page 170). বাংলা সাহিত্য জগতেও অন্ধ ভক্তের সংখ্যা বিরল নয়। অন্ধ আবেগের বশে আমরা কোন কোনও সাহিত্য সৃষ্টিকে প্রশংসার তুঙ্গে স্থান দিয়ে থাকি। বিশেষতঃ, রবীন্দ্র সাহিত্যে যে সমালোচনার উত্তাপ স্পর্শ করতে পারে না- সেকথা আমরা কমবেশী বিশ্বাস করি।

গীতাঞ্জলির ভগবৎ প্রেমে প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়, বিশেষতঃ গীতি কবিতাগুলির মধ্যে। অসামান্য সুররসিক ও সুরস্রষ্টা কবির কাব্যে গীতি কাব্যের প্রাধান্য খুব আশ্চর্যজনক নয়। প্রথমত উল্লেখযোগ্য সেইসব গান যেখানে ভক্তহৃদয়ের নিখাদ ভক্তি অর্পণ করা হয়েছে। যেমন- 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে' অথবা 'একটি নমস্কারে প্রভু' বা 'গরব মম হরেছ, প্রভু দিয়েছ বহু লাজ' অথবা 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব'- এসব গানে কবির মনে এক স্নিগ্ধ দাস্যভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্যই, এসব গানে কবি নিজের মনে ভক্তির স্তর নিজেই অনুভব করেছেন ও নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অনেকগুলি গানে ভক্তির সঙ্গে প্রেমের যোগ্য সমন্বয় ঘটেছে, যেখানে মধুর রসের অবতারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন- 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে' অথবা 'আমার এই পথ- চাওয়াতেই আনন্দ' বা 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার'- এইসব ক্ষেত্রে পূজা পর্যায়ের গান প্রেম, অর্থাৎ মানব প্রেমের পর্যায়ভুক্ত করলেও বিসাদৃশ্য বোধ হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর গানে ভক্তি আশ্রয় পেয়েছে প্রকৃতির রূপ বর্ণনার মধ্যে। যেমন- 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে, বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে' অথবা 'আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে' বা 'চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে'। ভক্তপ্রেমের গানে যেমন প্রেমিক মনের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি এসব গানে ভক্ত হৃদয়ের প্রকাশ পেয়েছে ঋতু বর্ণনার আশ্রয়ে। যেসব গানে প্রেম, প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে, সেসব গান নিরীশ্বরবাদী মনেও নিছক কাব্য রসের তরঙ্গ তুলতে পারে, যেমন- 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে' বা 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরানসখা বন্ধু হে আমার'। প্রকৃতপক্ষে, আজীবন সত্যসন্ধানী কবি ভক্তিরসের যে বৈচিত্র তাহা বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন- তার মূল সূত্র হ'ল প্রেম। কাব্যে শিল্প নিপুণতার ভূমিকা বাদ দিলেও যার মর্ম সংবেদনশীল মনে প্রতিধ্বনি জাগায় তার ভিত্তি প্রেমের উপরে। প্রেমবিহীন ভক্তি কল্পনা করা সম্ভব নয়। সেই প্রেমের বিস্তার ও গভীরতা তার বিশ্ব মানবিকতার গন্ডী ছাড়িয়ে সৃষ্টির সজীব ও কখনও জড় জগতের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। জীবন দর্শনের এই সর্বব্যাপী প্রসারের উৎস কোথায়, সেই আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের বাইরে।

গীতাঞ্জলির কবি তাঁর প্রেম নিবেদন করেছেন যে ভাষায় ও ভাবে তাহা সাহিত্যে অভূতপূর্ব এবং তার আবেদন সার্বজনীন। সেই কারণে বিদেশী সাহিত্য সমাজেও সেই গ্রন্থ সমাদৃত হয়েছিল। Ernest Rhys তৎকালীন ইংরেজী সাহিত্য গোষ্ঠীর এক রসগ্রাহী কবি ও সাহিত্যিক। গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে তাঁর রচিত রবীন্দ্র জীবনী গ্রন্থটিতে রবীন্দ্র সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'the wonder is that a poet from abroad with another mother tongue than our should have been able to use English with so pure and spontaneous a cadence. সুনিপুণ ও স্বাভাবিক ছন্দবোধ ও প্রয়োগ।' (Rhys: Rabindranath Tagore, 1916, Page 92).

বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যিক যাঁরা ইংরেজী ভাষায় দেশী বিদেশী বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সাহিত্য চর্চা করে থাকেন তাঁদের স্মরণে থাকা উচিত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই পথের প্রধান পথিকৃৎ।

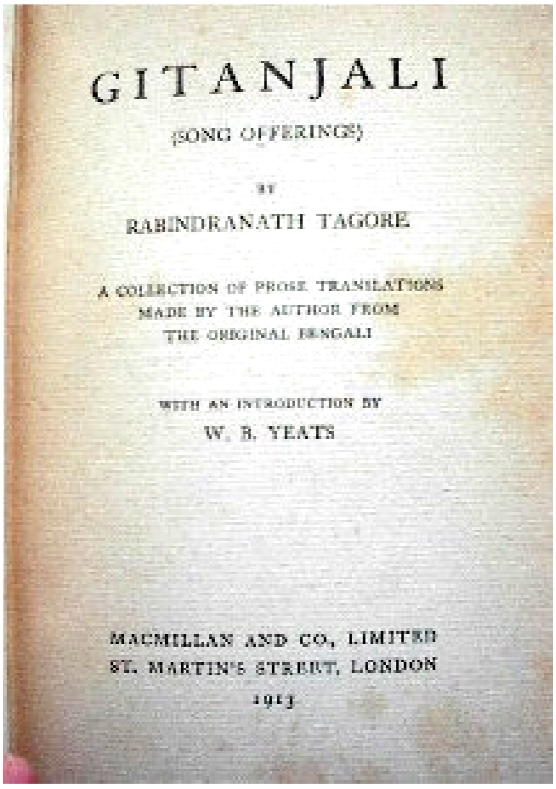
GITANJALI

(SONG OFFERINGS)

BY

RABINDRANATH TAGORE

A COLLECTION OF PROSE TRANSLATIONS MADE BY THE AUTHOR FROM THE ORIGINAL BENGALI

WITH AN INTRODUCTION BY

W. B. YEATS

MACMILLAN AND CO., LIMITED
ST. MARTIN'S STREET, LONDON
1913

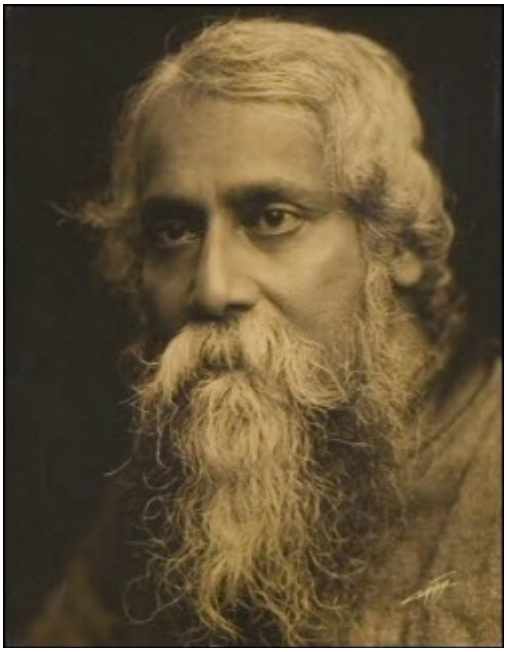

গ্রন্থ পরিচয়:

1. রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত) ১৯৬১
2. Rhys, Ernest: Rabindranath Tagore. 1916
3. Rothenstein, William: Men and Memories 1900-1922. 1978
4. Lago, Mary: Preface to Rothenstein (3)
5. Datta, Krishna & Andrew Robinson: Rabindranath Tagore, The Myriad-Minded Man. 1996
6. Yeats, William B.: Preface to Gitanjali [in English] 1913
7. Meister Eckehart: Von der Geburt der Seele [a collection of his sermons in German] n.d
8. আইয়ুব, আবু সৈয়দ: আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭)

(সঙ্গীত সভায় পাঠিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)

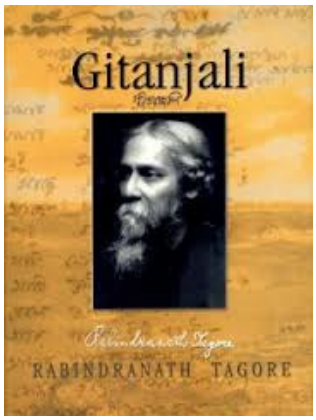

একটি না-বক্তৃক ভাষণ

ফণীন্দ্রমোহন দাস

আমি নাস্তিক। কথাটা এমন কি নূতন- ভাবছেন আপনারা। আমিও তাই ভাবি, কারণ যারা কথায় কথায় নিজেদের নাস্তিক বলে জাহির করে, তারা জানে না নাস্তিক কথাটায় কী পরিমাণ হ্যাপা! আমার একটি নূতন-পাওয়া বন্ধু বলছেন, ''আমাদের আদিম পূর্বসূরীরা নাস্তিক ছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু আদিম মানুষ অবশ্যই ছিল অ-জ্ঞা,'' আপনারা যদি বলেন 'অগা', আমি আপত্তি করব না কারণ তাদের দিনরাত্রিগুলি কাটত সর্বক্ষণ সমূহ জীবনসংশয় সামলাতে- দেবদেবী আছেন কিনা, আর থাকলেও তাঁদের আশীর্বাদে কোন সুবিধা হবে কিনা, তা ভাবার সময় বা সুযোগ কোনটাই হয়ত ছিল না।

''সারারাত গুহায় শুয়ে-বসে কী করত তারা?'' আপনাদের নৈয়ায়িক প্রশ্ন। ''তখন তো অশরীরী শক্তি, দানা, দেব, ঈশ্বর, ইত্যাদি ভাবনা তাদের মাথায় নিশ্চয় এসে থাকবে।'' এত নিশ্চয় হবেন না মশায় (বা, মশায়নী- কথাটা যদি অবৈয়াকরণিক হয়ে থাকে মাপ করবেন)। শারদীয়া মায়ের ভক্তিতে বিহ্বল হৃদয়ে প্রশ্নটা হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু যদি পূর্বসূরীদের নৈশ জীবন, যাকে আমরা আদর করে বলি 'নাইট লাইফ', যদি তার সমস্যাগুলি ভাবেন, তাহলে একটু থমকে যাবেন- না চমকালেও।

ভাবুন, প্রথমত, দিনটা কেটেছে তার শিকারের খোঁজে। যদি ভাল শিকার মিলে থাকে তাকে তৈরি করে খেয়ে সে ক্লান্ত- নিজেকে কোন রকমে টেনে এনে গুহায় ঢুকিয়ে, গুহার মুখ বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে, গুহার ফাটলে র‍্যাট্‌লার বা কেউটের বাচ্চা বসে আছে কিনা ভাবেনি, সারারাত ঘুমিয়েছে। আর- যদি শিকার না মিলে থাকে সে ক্ষুধার্ত, পরের দিন শিকার পাবে কিনা ভাবছে, ভোর-সকালে একটা হরিণের বাচ্চা মিলে যাবে, সেই আশা দিয়ে উদরদহন জ্বালায় শান্তিবারি সেচন করেছে। এই তার জীবন- দেবদেবী উদ্ভাবনের সময় কোথায় তার? মনে করুন প্রবাদটি- ''অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস দিশেহারা,'' অর্থাৎ পেটে ভাত, রুটি বা টর্‌টীয়ার অভাব হলে, কালিদাসের মত কবিরও কল্পনাশক্তি উবে যায়, আমাদের লক্ষাধিক বছরের বুড়ো দাদুর তো দূরের কথা।

একটা পুরনো গল্প বলি- 'নারদের দুধের বাটি'- অনেকেই শুনে থাকবেন। নারদের নামটা বাঙালিদের নিশ্চয়ই জানা আছে কারণ তারা প্রায় সবাই নারদের হয় সেঙাত নয় চেলা। অন্যদের অবগতির জন্য বলি, নারদ একটি বিখ্যাত ঋষি, তাঁর প্রধান পেশা বীণা বাজিয়ে বিষ্ণু- তথা হরি-গুণগান। কাজটা একঘেয়ে, তাই নারদ মনোরঞ্জনের জন্য কোঁদল সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণু কিছু মনে করেন না, কারণ তাঁর রহস্যবোধ গভীর। কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে তিনি যে পরিমাণ ঝুটঝামেলা বাধিয়েছিলেন তার বর্ণনায় ভরা আছে মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি বহু পুণ্যগ্রন্থ।

এক সময় তিনি একটি ছোট্ট রগড়ের গন্ধ পেলেন। অন্তর্যামী টের পেলেন নারদের মনে একটু অহমিকার উদয় হয়েছে। মুনি মনে করতে শুরু করেছেন যে তিনি ত্রিভুবনে সর্বোৎকৃষ্ট হরিভক্ত। করবেন না কেন- তিনি সারাক্ষণ হরিনাম কীর্তন করেন। যখন তখন বিষ্ণুর আদেশ পালন করেন। তাঁর দেহ ও মন সর্বতোভাবে হরিময়। নারদ বেশ ফুরফুরে মনে হরিকীর্তনে মেতে আছেন এমন সময় মনে বৈকুণ্ঠাধিপতির আহ্বান শুনতে পেলেন। তড়িৎগতিতে ঢেঁকি চালিয়ে তিনি বিশ্বপিতার সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর আদেশ প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণু মুচকি হেসে বললেন, ''নারদ, হাজার কাজে ব্যস্ত থাকি, অনেকদিন আমার প্রিয়তম ভক্তের খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। তাকে একটু দেখে আসবে?'' ''অবশ্যই, বিশ্বপালক,'' বললেন নারদ, কিন্তু তাঁর মনটা ব্যাজার হয়ে গেল। তিনি গোলোকনাথের কাছে তাঁর 'প্রিয়তম' ভক্তের ঠিকানা নিয়ে পরদিন অতি প্রত্যূষে গেলেন তাকে দেখতে। যথাস্থানে গিয়ে দেখলেন ভক্তটি একজন কৃষক, শয্যাত্যাগ করে কপালে হাত জোড় করে, প্রাণখুলে বলছে, ''হে শ্রীহরি, মধুসূদন!'' তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে ছেলেমেয়েদের আদর করে, গৃহিণীর পরিবেশিত দুমুঠো ভাত খেয়ে, কাঁধে লাঙ্গল চাপিয়ে বেরিয়ে গেল দিনের কাজে। সারাদিন চাষবাসের পর ঘরে ফিরে প্রথমে ছেলেমেয়ে ও গৃহিণীর দিন কেমন কেটেছে তার খবর নিল। বৈকালিক দেহপ্রক্ষালনাদির পর নৈশাহার শেষ করল এবং ঘুমুতে যাবার আগে আর-একবার হরিনাম স্মরণ করল। সারা হল তার দিনের কাজ। নারদ রওনা দিলেন বৈকুণ্ঠের পথে।

প্রভু জনার্দনের এই মহাভক্তকে দেখে নারদের উষ্মা কয়েক ডিগ্রি চড়ে গেল। ''আরে ছ্যা ছ্যা, একটা লোক- যে দিনে দুবার মাত্র হরিনাম স্মরণ করে, সে হয়ে গেল কিনা বিষ্ণুর প্রিয়তম, আর সারাদিন হরিকীর্তন করে আমার স্থান হল তার নীচে। এ চক্রপাণির অবিচার,'' ভাবতে ভাবতে নারদ ঢেঁকিকে এমন তাড়া লাগালেন যে দেখতে না দেখতে গোলোকে পৌঁছে গেলেন। পরদিন বেশ উষ্মার সঙ্গে তাঁর প্রতিবেদন ঝাড়লেন চক্রধরের চরণে।

আবার স্মিতাস্য সহস্রাস্য নারদকে বললেন, ''তোমাকে আরো একটা কাজ করতে হবে। ভূমণ্ডলস্থ জনমণ্ডলের সারা যুগ ধরে কৃত কুকর্মক্ষরিত দুগ্ধ একটি বাটিতে জমা হচ্ছে। বাটিটা প্রায় উপচে পড়ার পথে। বাটিটা যদি আজই পঞ্চাননের কাছে নিয়ে যেতে পার তবে সৃষ্টি রক্ষা পায়। পারবে?'' ''বিশ্বপিতার আশীর্বাদে আশা করি পারব,'' বলে নারদ বাটি হাতে নিতে গেলেন। ''কিন্তু, নারদ, সাবধান,'' বললেন বলিসূদন, ''বাটির আধেয় তরল পদার্থটি দেখতে দুগ্ধধবল কিন্ত এ কালকূট। এ বিষের স্থান একমাত্র নীলকণ্ঠের কণ্ঠে। অন্য যে কোন স্থানে যদি তার একটি ফোঁটাও পড়ে তবে ব্রহ্মাণ্ড ছারখার হয়ে যাবে।'' শুনে উদ্মিত নারদের অন্তর সন্ত্রাসে হিম হয়ে গেল। বুঝলেন এ বাটিকে হেলাফেলা করা চলবে না। সুতরাং যাত্রার আগে তিনি বীণাটি থলেয় ভরলেন এবং সারা দেহ ও মন স্থির করে বিষের বাটিটি দু-হাতে ধরে, কৈলাশ যাত্রা করলেন। নানা আবেগে পূর্ণ তাঁর মন বিশ্ববিধাতাকে একটি প্রণাম জানাতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

বিষের বাটি হাতে নিয়েই নারদ বুঝতে পারলেন কী দুরূহ কাজ খগাসন তাঁকে দিয়েছেন। বাহন হিসাবে ঢেঁকি যে গরুড় হতে ভাল নয়, তা ঋষিরাজ অল্পেই টের পেলেন। ঝটিকাতাড়িত ভবার্ণবে ভাসমান নৌকোর মত চলনশীল সেই ঢেঁকিতে বসে তরলগরলপূর্ণ বাটিকে সমতল রাখতে গিয়ে তিনি সব কৌঁদল ভুলে গেলেন। ভরা বাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, যথাসময়ে কৈলাশে শিবের হাতে বিষভরা বাটি তুলে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

সহসা নারদের মনে পড়ল, বৈকুণ্ঠ ছাড়ার পর এ পর্যন্ত একবারও তিনি হরিনাম স্মরণ করেননি। দর্পহারীর চাতুরী বুঝতে পেরে তাঁর মন ভক্তিতে আপ্লুত হল। হরিঠাকুরের পরম ভক্তকে বুঝতে পেরে তাঁকেও তিনি মনে মনে প্রণাম জানালেন, এবং চতুর্গুণ উৎসাহে হরিনাম কীর্তন করতে করতে বৈকুণ্ঠে পৌঁছে কর্তব্যসাধনের প্রতিবেদন নিবেদন করলেন!

আমাদের অতিবৃদ্ধ আদিম মানুষটির জীবন কি দুগ্ধবহনরত নারদের চেয়ে সহজ ছিল? নারদের কাজে সমস্যা ছিল বিশ্বভুবনকে প্রলয় হতে বাঁচিয়ে রাখা, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনসংশয় ছিল না। তবু তিনি গোলোকনাথকে একটিবার স্মরণ করতে ভুলে গেলেন। যে অগা আদিম পুরুষটি সারাক্ষণ তার সংশয়াকুল জীবনটুকু রক্ষায় রত, তার পক্ষে একটি আস্ত বিষ্ণু সৃষ্টি করা কি সহজ?

''বিষ্ণু সৃষ্টি করা? কী সর্বনাশ!'' আপনি কানে আঙ্গুল দিচ্ছেন নিশ্চয়ই। বলছেন, ''বিষ্ণুকে সৃষ্টি করতে হবে কেন? তিনি তো স্বয়ম্ভূ ত্রিমূর্তির দ্বিতীয় মূর্তি- প্রথম মূর্তি ব্রহ্মা আদিম মানুষদের (আদমদের?) সৃষ্টি করে বিষ্ণুর হাতে তুলে দিয়েছেন। বিষ্ণুই তাদের রক্ষা করেছেন, তাদের উত্তরপুরুষদেরও রক্ষা করেছেন ও করছেন। তাই তো আমরা সব বেঁচে আছি।''

কী সহজ, সরল সমাধান! জীব সৃষ্টি করেছেন একজন, রক্ষা করবেন আর-একজন, সব ছকে বাঁধা। উপনিষদ বলে, ''আনন্দং ব্রহ্ম ইতি। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যমভিসংবিশন্তি।'' যাদুবলে তিন হয়ে গেল এক। এক আনন্দ, এক ঈশ্বর। জীবনসমস্যার সমাধান হল- সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সব এক ঈশ্বরের হাতে!

নাস্তি-ভবনে মেরামতির জন্য এসেছিল একজন কারিগর। তার বয়স বত্রিশ বছর, চারটি ছেলেমেয়ে। জিজ্ঞেস করেছিলাম তাকে, ''তোমার এত বড় দায়িত্ব- এতজন ছেলেমেয়ের খাওয়া-পরা, পড়া-লেখা- সব ঠিকঠাক চালাতে পারছ তো?'' জবাব পেলাম, ''আল্লা এদের দিয়েছেন, তিনিই দেখবেন।'' অর্থাৎ, আবার সেই কথা- যিনি দিয়েছেন, তিনিই দেখবেন। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভগবদ্বিশ্বাসীদের একই আশ্বাস। ধর্মগুরুরা এই অতিসরলীকৃত জীবনদর্শনে বাস্তবতা সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক বাগ্বিস্তার করেছেন। ফলে অনেক পুণ্যগ্রন্থ লিখিত হয়েছে। তৈরি হয়েছে অনেক মত, অনেক পথ, অনেক ধর্ম। কিন্তু সবার মূলে সেই স্বয়ম্ভূ, মানে ভুঁইফোঁড়, ঈশ্বর। অনুবাদটা ঠিক হলো না, কারণ, ঈশ্বর যখন 'হলেন' তখন ছিল সব শূন্য- সে এমন শূন্য যাতে এখন যা আছে তা তো ছিলই না, এমন কি যা এখন নাই তাও ছিল না। এই চরম শূন্য ফুঁড়ে উদয় হলেন স্বয়ম্ভূ! বুঝুন ঠ্যালা। আমরা যারা পন্ডিত নই, ধর্মগুরু নই, নিছক সাধারণ মানুষ, আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে- শূন্যফোঁড় ঈশ্বরকে নিয়ে এই যে এত লেখালেখি, তর্কাতর্কি, মারামারি তার মধ্যে সার বস্তু কি কিছু আছে?

না-দার্শনিক, না-বক্তা প্রশ্নটার একটি চট্-জলদি জবাব (না-জবাব?) দেবে,- ''জানি না!'' এর চেয়ে ভাল জবাবের চেষ্টা করেছেন একজন সত্যিকারের দার্শনিক- বারট্র্যান্ড রাসেল (Bertrand Russell)। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহার করে তিনি যা বলার চেষ্টা করেছেন তা না-বক্তার ভাষায় দাঁড়াবে এই রকম: পৃথিবী সৌরমন্ডলের একটি মাঝারি আয়তনের গ্রহ, যা সমগ্র সৌরমন্ডলের বস্তুসম্ভারে একটি ক্ষুদ্র নুড়ি মাত্র। জবাকুসুমসঙ্কাশ, মহাদ্যুতি, ধ্বান্তারি, সর্বপাপঘ্ন কাশ্যপেয়-সূর্য একটি সাধারণ নীহারিকার লক্ষকোটি নক্ষত্রের একটি। এ প্রকার বহু কোটি নীহারিকার এক বিরাট সমাবেশ এই নভোমন্ডল- ঈশ্বর যার সৃষ্টিকর্তা। তাঁর চোখে আমি মানুষ, তুলনায় একটি পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কবিবর তাঁকে বলতে পারেন, ''দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে,'' কিন্তু আপনার আমার মতো অকিঞ্চিৎকরদের পক্ষে তা বলা মনে হয় নীহারিকা-প্রমাণ মূর্খতা!--- জানি, জানি। আমি যে সত্যি মূর্খ তা প্রমাণ করবার জন্য ব্রহ্মবাদী ঈশোপনিষদ আওড়াবেন, উলেমা মুন্ডচ্ছেদের ফতোয়া জারি করবেন, আরো অনেক রক্তনেত্র ভর্ৎসনা আমার কপালে জুটবে। তবু ন্যায়ের সম্মান রক্ষার জন্য আমাকে একথা বলতেই হবে। প্রতিবেশী আমাকে অপমান করে গেল, তার প্রতিশোধ নেবার শক্তি, বা তাকে ক্ষমা করার ঔদার্য কোনটাই নেই, সেই-আমি বিশ্বস্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলাম, ''ঠাকুর, তুমি প্রতিবিধান করো।'' এ শুধু মূর্খতা নয়, মহাবিশ্ব পরিমাণের ঔদ্ধত্যও বটে।

লক্ষ্য করে থাকবেন, না-বক্তা অনেক বাগ্বিস্তার করেছেন কিন্তু মূল প্রশ্নের উত্তরে না-জবাবের বেশি একটুও এগুতে পারেননি। তিনি পুরনো দার্শনিকদের কথার ভুলভুলায়ার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, বিজ্ঞানের পথে এগোননি।

বাঙলার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করে 'প্রচার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এক গুচ্ছ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেগুলি তাঁর জীবৎকালে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়নি, পরে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসের উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-কর্তৃক গ্রথিত হয়ে 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। (গ্রন্থটি এখন 'সাহিত্য সংসদ' কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড'-র অন্তর্ভুক্ত।) এই প্রবন্ধমালার একটি 'চৈতন্যব্যদ'- যাতে ঋষি একটি পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক তথ্য উল্লেখ করলেন, ''পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে তার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। সকলেরই এক একটা ধর্ম আছে, এমন কোন জাতি আজি পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোন ধর্মজ্ঞান নাই।'' তাদের ধর্ম কোথা হতে এল? এটাই মূল প্রশ্ন- ঋষির এবং আমাদেরও। জবাবে যদি বলি- ঈশা, মুসা, বুদ্ধ বা ঈশ্বর তাদের মধ্যে ধর্মজ্ঞান সৃষ্টি করেছেন- তা হলে আবার না-জবাবের গর্তে পড়তে হবে।

বরঞ্চ, প্রশ্নটার বৈজ্ঞানিকতা বুঝতে আরো একটু পেছনে গিয়ে, এবং সন্দেহাতীতভাবে মনকে বুঝাই- মানুষ ছাড়া ধর্ম হতে পারে না। তারপর প্রশ্ন করি- মানুষ কোথা হতে এল? প্রশ্নটা বৈজ্ঞানিক এবং একে বুঝতে হলে পেছনের অনেক প্রশ্নোত্তর-পরম্পরা ও সমাধান গড়তে হবে। আমরা শুরুতেই ধরে নেব ডারউইনের তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত। 'প্রবাস-বন্ধু'র বাং ১৪১৯ সালের শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত 'আগাছা দর্শন' প্রবন্ধে আমরা মানুষকে পাই বর্তমান সময়ের প্রায় দু-লক্ষ বছর আগে যখন প্রাগৈতিহাসিক সেই মানুষের দৈহিক গঠন, মস্তিষ্কের কোষ ও তাদের কার্যপ্রণালী প্রায় আজকের মানুষের সমকক্ষ হয়ে গেছে। তবে একটা বিরাট পার্থক্য- তার দৈনন্দিন প্রাণধারণ নির্ভরশীল ছিল তার জৈবিক স্বজ্ঞা (animal intuition) -এর উপর। সে মস্তিষ্ককোষগুলিকে ব্যবহার করে তার চতুষ্পার্শ্বকে বুঝতে শেখেনি; একদিনের অভিজ্ঞতাকে দ্বিতীয় দিন ব্যবহার করতে শেখেনি। তবে একটা শিক্ষাপদ্ধতি চলছে তার ভেতরে, খুবই শ্লথগতিতে। তারপর প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার বছরের প্রস্তুতির পর তারা কৃষিভিত্তিক সভ্যতার পত্তন করেছে, যদিও তা ছিল প্রস্তরনির্মিত যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল।

গত দশ হাজার বছরে মানুষের সভ্যতা (অর্থাৎ তার মস্তিষ্কের প্রয়োগশক্তি) বেড়ে চলল ত্বরিত গতিতে। কাজের যন্ত্রপাতি তৈরিতে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে শুরু হল ব্রোঞ্জের ব্যবহার, এবং চার হাজার বছর আগে লোহার। বড় বড় শহর তৈরি হল মিশরে, মেসোপোটেমিয়া, ভারত-উপমহাদেশের সিন্ধু-উপত্যকা এবং আরো অনেক স্থায়ী বাসের উপযোগী অঞ্চলে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল গণসংযোগ ও সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা। ছ-হাজার বছর আগেই তারা হয়ে উঠেছিল আমাদের মত সভ্য যদিও তারা আমাদের মত আই-ফোন (iPhone) তৈরি করতে শেখেনি। কিন্তু তাদের বুদ্ধিবৃত্তিগুলি আমাদের চেয়ে কোনমতেই কম ছিল না। অর্থাৎ তারা যেমন শিখেছে মানুষকে ভালবাসতে এবং শ্রদ্ধা ও ভয় করতে, তেমনি শিখেছে নিজের চতুরতা খাটিয়ে অন্যদের সরলতার সুযোগে নিজেদের সুবিধা করে নিতে। এ ধরনের ব্যবহারের অনেক উদাহরণ বেদে, এবং অন্য ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়, যদি গ্রন্থগুলি পড়বার সময় একটু বাস্তবতার মিশেল দেওয়া যায়।

এবার দেখা যাক আদিম মানুষ কেমন করে দেবতা সৃষ্টির প্রেরণা পেল। যে প্রণালীটি আপনাদের কাছে বিবৃত করতে যাচ্ছি তা ঘটতে পারত কমপক্ষে দশ হাজার বছর আগে হতেই।

ধরুন, একজন চতুর দার্শনিক ঘটনাচক্রে আবিষ্কার করলেন, মাংস বা ভুট্টা পোড়ালে খেতে সুস্বাদু হয়। কারণ হিসাবে তিনি বললেন, আগুন- অগ্নি- একজন নৈসর্গিক দেবতা যাঁর আশীর্বাদে এই সুফলটি পাওয়া যায়। এবার আর একজন দেবতা যিনি অনেক ধনের অধিকারী, ধরুন তিনি ইন্দ্র, তাঁকে প্রসন্ন করতে যে খাদ্য পরিবেশন করতে হবে তা সুস্বাদু হতে হবে। কাজেই অগ্নির আশীর্বাদপূত খাদ্য প্রস্তুত করো। সেই অগ্নি বিশেষভাবে প্রস্তুত কুন্ডে, মন্ত্রপূত সমিধ দিয়ে প্রজ্বলিত হবে। প্রত্যেকটি জিনিস যা ব্যবহৃত তাকে মন্ত্র দিয়ে আহ্বান করে আনতে হবে। অগ্নি যখন প্রজ্বলিত হলেন তাকে প্রসন্ন করার মন্ত্র চাই। মনে করা যায়, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মন্ডলের যে প্রথম সূক্তটি রচনা করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল যজমানদের জন্য কৃত কোন যজ্ঞের শুরুতে অগ্নিকে প্রসন্ন করা। এই অগ্নিপূজনের প্রণালী ও মন্ত্র হ'ল মধুচ্ছন্দা ঋষির ''মেধাসম্পদ (intellectual property)''।

বিবৃত উদাহরণটি কাল্পনিক, কিন্তু অযৌক্তিক নয়। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় অনেক অনেক দেবতা সৃষ্ট হয়েছে, অনেক অনেক নৈসর্গিক ধর্মে- যথা, ভারতে হিন্দুধর্মে, প্রাচীন গ্রীসের ধর্মে, মিশরের প্রাচীন ধর্মে। যদি এ অবস্থিতি আজও থাকত, নাস্তিক হওয়া হ'ত বিরাট ঝামেলা। কিন্তু পৃথিবীতে এখন একেশ্বরবাদের রমরমা চলছে। তাতে নাস্তিক হওয়া হয়েছে অনেক সহজ।

সে কাহিনী পরে একদিন।

কবির পাঠিকা
শেলী শাহাবুদ্দিন

কবির পাঠিকা লায়লা বেগম,
খুশিতে খুলিয়া মনের পেখম,
নাচিতে নাচিতে, চলিতে চলিতে,
স্ফূর্তি মনের বলিতে বলিতে,
মনের গোপনে আঁকিয়া ফেলিল অপরূপ এক ছবি।

দেখিতে সে যেন কবি নজরুল,
সৌম্য সে রূপে বাবরির চুল,
পরিধেয় তার শুভ্র বসন
মৃদু সুগন্ধে ভরে যায় মন,
দেখিতে শুনিতে রমণীমোহন, এই যেন তার কবি।

কবিতার স্রোত আসে আর যায়,
কিছুই তাহার নাহি আটকায়;
অভিজাত গৃহে আয়েসে বসিয়া,
রচিতেছে কবি কাব্য কষিয়া,
ভাবিতেছে শুধু চক্ষু মুদিয়া নায়িকার কিবা রূপ!

দেখি সেই শোভা, লায়লা বেগম,
আদব ভুলিয়া ভারি বেশরম,
দেখিতে দেখিতে একাগ্র মনে,
প্রেমে পড়ি গেল সেই কবি সনে,
বিচিত্র গতি রমণীর মন, প্রেমে তারা অপরূপ!

শুনি এইসব লোমহর্ষক,
শিহরি আমার দেহে কন্টক!
হৃদয়ে যাহার আঁকিয়াছ ছবি,
আমি নহি সেই প্রার্থিত কবি।
কলমের দাস, আছে বিশ্বাস,
লিখে যাই শুধু যখন যা চাই।

কবি ও কবিতা একই ভাবি মনে,
গড়িয়াছ শিব মনের গোপনে।
দেখিবে যখন মর্কট মুখ,
হৃদয়ে তোমার জাগিবে যে দুখ,
লাঘব করিব সেই দুখ তব, এমন সাধ্য নাই।

কাছে এলে মোর দেখিবে যখন,
পরিধেয় যত এখন-তখন,
ঘামের গন্ধ মোটে ভাল নয়,
শরীরটা যেন ক্ষীণ অতিশয়,
মধ্যবিত্ত বাংলার কবি, অতিশয় উদ্ভট!
তখন ও চোখে জল টলমল,
থামাইব তারে কী করিয়া বলো?
ওই মনোলোভা ওষ্ঠ রঙ্গীন,
অভিমানে ফুলে আরো সঙ্গীন!

কবি ও কবিতা জট পাকাইয়া ভয়ানক সংকট!
ভালবাসা যারে করেছিলে দান,
অবহেলা ভারে সেই কবিপ্রাণ
দেখিবে সেথায় মরিতেছে ধীরে,
আসো যদি তার হৃদয় গভীরে,
এই যন্ত্রণা অতি ধীরে ধীরে আয়ু তার করে চুরি।

এখনও যে তার প্রেমের কাব্য
তোমার হৃদয়ে রয়েছে নাব্য,
সেই আনন্দে কৃতজ্ঞ কবি,
লড়ে যাবে এক মহাবিপ্লবী
যতদিন তারে থামাতে না পারে শেষ সন্ধ্যার তরী।

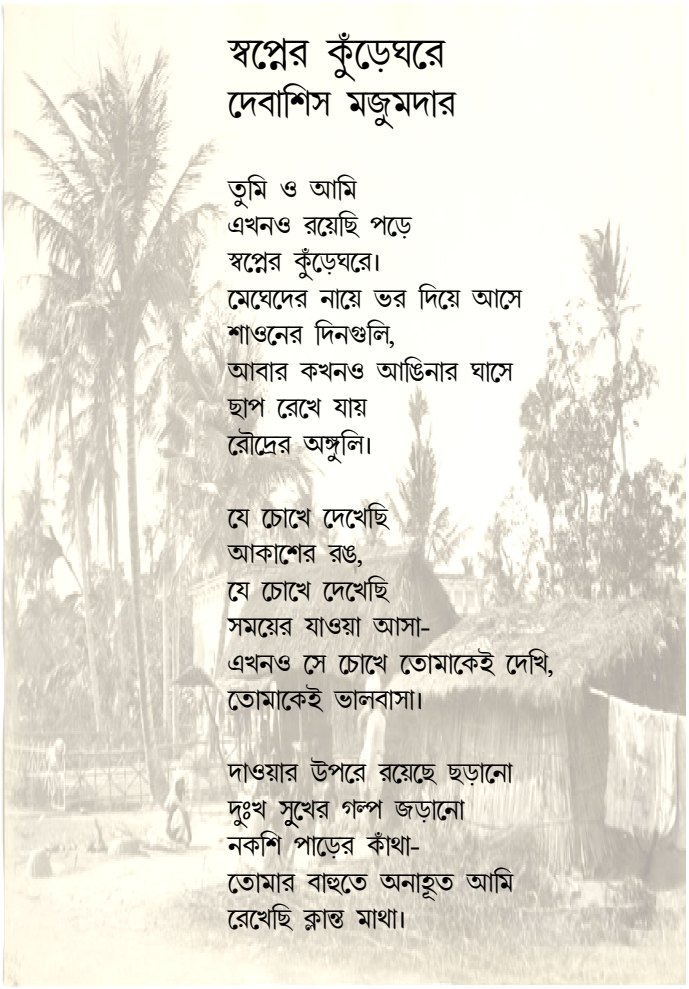

স্বপ্নের কুঁড়েঘরে
দেবাশিস মজুমদার

তুমি ও আমি
এখনও রয়েছি পড়ে
স্বপ্নের কুঁড়েঘরে।
মেঘেদের নায়ে ভর দিয়ে আসে
শাওনের দিনগুলি,
আবার কখনও আঙিনার ঘাসে
ছাপ রেখে যায়
রৌদ্রের অঙ্গুলি।

যে চোখে দেখেছি
আকাশের রঙ,
যে চোখে দেখেছি
সময়ের যাওয়া আসা-
এখনও সে চোখে তোমাকেই দেখি,
তোমাকেই ভালবাসা।

দাওয়ার উপরে রয়েছে ছড়ানো
দুঃখ সুখের গল্প জড়ানো
নকশি পাড়ের কাঁথা-
তোমার বাহুতে অনাহূত আমি
রেখেছি ক্লান্ত মাথা।

কল্লোলিনী কলকাতা
ডলি ব্যানার্জী

আমি আবার এলাম ফিরে,
বৃষ্টিভেজা পায়ে পায়ে,
প্রাচ্যের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমের উপকূলে।
শঙ্খচিল, শালিখ না হয়ে,
কিছুটা মানুষ হয়ে।
স্বভূমির হয়েছে কিছু পরিবর্তন
এখনও হারায়নি শাশ্বত আবেদন।
স্বচক্ষে দেখলাম ক্ষত-বিক্ষত আত্মীয় স্বজন
জীবনযুদ্ধে মরণাপন্ন সংগ্রাম,
আপদ বিপদে এরাই কিন্তু হাসিমুখে সর্বক্ষণ।

জবুথবু কলকাতা যেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলী,
কোথায় গেল কবিগুরুর 'কিনু গোয়ালার গলি'?
ফোরামের চত্বর, সাউথ সিটি মল্,
হয়ে উঠেছে বিলাসিতায় ঝলমল।
রঙচঙে মানুষ, রঙচঙে কাগজী ফুলের বাহার
এখনও ম্লান হয়নিকো-
বর্ষার বারিস্নাত জুঁইফুল আর রজনীগন্ধার ঝাড়।
মিউজিক্ ওয়ার্ল্ডের উদ্দাম কণ্ঠস্বর
ওঠেনি কি ছাপিয়ে অজয় চক্রবর্তী,
রশিদ খানের বাগেশ্রী, কানাড়া রাগের সুমিষ্ট সুর?
দুরন্ত গতির মেট্রো- আলোর রোশনাই ত্রিফলা
আধুনিকতার পাঠশালা।

ল্যাপ্‌টপ্, ফেস্‌বুক্ ছেড়ে
এখনও মানুষ ভিড় করে বই-মেলায়।
ইতিহাসের নীরব সাক্ষী শহিদ মিনার
বুভুক্ষু সংগ্রামী মানুষের হাহাকার।
এরই মাঝে ফিল্ম উৎসবের সেরিমনি;
সেখানেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে বাংলার 'কাহিনী'।

এখনও এয়ার কন্ডিশন্ ছেড়ে,
দখিন হাওয়া খেলে মুক্ত বাতায়নে।
এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন লেকের ধারে
শিশির সিক্ত ঘাসের ছন্দ;
আপন মনে উড়ে বেড়ায়
নাম-না-জানা মুক্ত বিহঙ্গ।

রাতভর বৃষ্টি হয়েছে অনেকদিন পর,
গা ধুয়েছে কলকাতা,
ধুয়ে ফেলেছে রক্তপাত,
বুকের ভেতর জমে থাকা
কতকালের রাগ-দুঃখ, মান-অভিমান,
গুমরে ওঠা কত কথকতা।
বৃষ্টির অঝোর ধারায়, আপন মনে,
গান শোনায়- সেই
শাশ্বত কল্লোলিনী কলকাতা একই তানে।

··•❖•··

যোগসূত্র
মুকুল ঘোষহাজরা

ভালবাসি তাই
নাড়া দেয় ওপারের উচাটন
এপারের প্রশান্তিতে।
ওপারের ঢেউ ধাক্কা দিয়ে আছড়ে পড়ে
এপারের চরা বালুতে।
সেতু যে বাঁধা আছে,
তাই একদিকের সন্তর্পণ পদক্ষেপও
অন্যদিকে তোলে স্পন্দন।
সেতারের সাতটি তারের ঝঙ্কারে তোলে অনুরণন
তরঙ্গ তার ভেসে এসে ছুঁয়ে যায়
সুদূরের পথিককে,
সুরের ছোঁয়ায় অভিভূত হয় সে।
দূরে থাকা আর হয় না,
একাকীত্ব আর হ'ল কৈ!
বাঁধন ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র হওয়ার সাধন কঠিন!
যদি সম্ভব হয়-
মুক্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে যবে নিজেকে বুঝি,
নিজেকে পাই-
তখন তো আর নাই, ভয় নাই!
ভালবাসার কঠিন জালে, জড়িয়ে পড়েও মুক্তিরে পাই-
বুঝি ভিতর বাহির সবই এক, একই সবাই।
একই সেই, ভিন্ন প্রকাশ, ব্যাপ্তিও তাই
ব্যাপ্ত চরাচর।

··•❖•··

স্মৃতি তর্পণ- আমার ছেলেবেলার মহালয়া

জয়া ঘোষ

আজ মহালয়া। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের শুরু। প্রায় আঠারো বছর পরবাসে আছি। সারা বছর কোনভাবে দিনগুলো কেটে গেলেও বছরের এরকম কিছু সময় আসে যখন পেছনে ফিরে তাকাতেই যেন বেশী ভালবাসি আমরা। শরতের সোনাঝরা রোদ্দুর দেখলেই মনটা যেন বহুদূরে ফেলে আসা শৈশবে শারদোৎসবের সেই সুন্দর দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার ছোটবেলার মহালয়া মানেই পুজোর আনন্দের শুরু।

আমাদের বাড়িতে মহালয়ার আগের দিন রাতেই বড়দা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখত। এই একটা দিনই বলতে গেলে আমি কাকভোরে ওঠার কথা ভাবতে পারতাম। মনে আছে মা বলত শুয়ে শুয়ে মহালয়া শুনতে নেই তাই ইচ্ছে না থাকলেও উঠে পড়তাম আমরা ভাই বোনেরা। ঐ একটা দিন ভোরে শত ইচ্ছা থাকলেও আমরা মেয়েরা কেউ চা বানাতাম না। ঐদিন চা করার একমাত্র দায়িত্ব ছিল আমার বড়দার। কেন জানি না আমাদের সেই অবাঞ্ছিত আবদার দাদা প্রতি বছরের একটা অলিখিত রুটিনের মত মেনে নিয়েছিল। মাও সেদিন সকালের প্রাত্যহিক রুটিন বদলে চোখ বুজে হাত জোড় করে মহালয়া শুনত একমনে। আগমনী ভোরে আমাদের পাড়ার কয়েকজন বন্ধু মিলে আমরা বেরোতাম রিঙ্কুদের বাড়ি থেকে ফুল তুলতে। 'বাজল তোমার আলোর বেণু' গানটা শুরু হলেই দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে আসতাম। আবছা আলো আঁধারির ভোর। আকাশটা কেমন যেন শান্ত, নীলাভ লাগত। অদ্ভুত একটা শিরশিরে ভাব। পাখীদের ঘুম না ভাঙা, শিশির ভেজা ঘাসে শারদীয়ার সুবাস মাখা ভোর। বন্ধুর বাড়ির শিউলি গাছের গন্ধ ভেসে আসত বাতাসে। আমাদের গড়িয়ার বাড়িতে শিউলি গাছ ছিল না কিন্তু বাইরের গেটের এক ধারে মা লাগিয়েছিল একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। আমার মনে আছে সেবার বনদপ্তর থেকে পাড়ায় পাড়ায় খুব গাছ দিয়ে গেল। রাস্তার ধারে বাড়ি আমাদের। জায়গা কম কিন্তু তা সত্ত্বেও মা জোর করেই পুঁতেছিল ঐ গাছটা। হয়ত মা জানত একদিন তার অনুপস্থিতিকে মনে করিয়ে দেবে ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছ। মহালয়ার ভোরে বারান্দার গ্রীল ধরে ঐ গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন পুব আকাশে ধীরে ধীরে আলো ফুটতে শুরু করত।

'আশ্বিনের শারদ প্রাতে জেগে উঠেছে আলোক মঞ্জরী', কথাগুলো শুনলেই সারা শরীরের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত আবেগ উথলে উঠত। সে আবেগের পুরোটাই ছিল নির্ভেজাল এক আনন্দের। পুজো শুরু হওয়ার আনন্দের, দৈনন্দিন জীবনের একঘেঁয়ে নিয়ম ভাঙার আনন্দের। পড়াশুনা ফেলে আপন খুশিতে মেতে ওঠার আনন্দের। সে আবেগে কোন না পাওয়ার দুঃখ বা প্রিয়জন হারাবার ব্যথা ছিল না কোনদিন।

আগমনী ভোরে মহালয়া শেষ হলে আমাদের পাড়ার কয়েকজন বন্ধু মিলে আমরা বেরোতাম ফুল তুলতে। তারপর যেতাম হরিণঘাটার দুধের ডিপো থেকে সকালের দুধ আনতে। বছরে এই একটা দিন আমরা একটু বাড়ির কাজ করার নামে বড় রাস্তায় ভোরবেলা ঘুরে আসার বেশ একটা ছুতো খুঁজে বার করতাম। তারপর জিলিপি কিনে খেতে খেতে বাড়ি আসতাম। ততক্ষণে আমাদের বাড়ির সামনের জমিটায় শুরু হয়ে যেত সুজয়দের গ্রুপের মহালয়া কাপ-এর ম্যাচ। সেভেন সাইডেড্ ফুটবল খেলা। সে এক অদ্ভুত মজার খেলা। মাথা থেকে এই রকম ফুটবল খেলা কে বার করেছিল কে জানে! বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে দেখতে গোল হলে চেঁচানো আর মিস্ করলে আক্ষেপ এইসব করেই সকালটা কাটত। পরে মায়ের ডাকে ঘরে গিয়ে জল-খাবার খেয়ে নিজের খেয়ালে আর কী কী করতাম, ঠিক ভাল করে মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে মহালয়া মানেই পুজোর শুরু। পড়াশুনা শিকেয় তুলে পুজোর জামা জুতোর হিসেব নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়।

শুনেছিলাম ঐদিন তর্পণ করে বড়রা। আমার কাকা করতেন। বাবাকে খুব একটা কিছু করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু মা দেখতাম একটু যেন বেশি ভাবমগ্ন হয়ে যেতেন মহালয়ার ভোরে। তখন বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝেছি মায়ের মনটা হয়ত হারিয়ে যেত, মায়ের শৈশবের সেই শারদপ্রাতে, বরিশালের সেদ্ধকাঠি গ্রামের হাইস্কুলের মাঠে বকুল-ফুল-সই-এর সাথে মায়ের মেয়েবেলার সেই ঝলমলে দিনগুলোর মেঠো পথে। হয়ত মাম্মা-মানে মা'র মায়ের কথা মনে পড়ত। তখন বুঝিনি। আজ বুঝি মা কেন এইসব বিশেষ দিনগুলোতে বেশি করে বলত তার দেশের কথা, আমার দাদু-দিদা, মায়ের প্রিয়জনেদের কথা। বাবাদের দেশের বাড়ির দুর্গা পুজোর ধুমধামের কথা। মায়েদের নাট মন্দিরে ঠাকুর তৈরীর গল্প। মায়ের মনেও ছিল শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখ। আমাকে মা কেবলই অনুনয় করে বলত- 'বাবলি আমি তোমাকে আমার দেশের বাড়ির গল্প শোনাব তুমি লিখবে, তুমি আমার গল্প শুনে সেই ছবি আঁকবে তো?' কিন্তু তখন আমার মায়ের গল্প শোনার সময় ছিল না। মা, কী করে বোঝাব আমি তখন তোমার শেকড় ছেঁড়ার কষ্ট বুঝতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করে দিও। আজ আমি বিদেশে থাকলেও তিন বছরে একবার দেশে যাই। নেট্-এ বসে গুগল্ ম্যাপে আমাদের বাড়িটাকে খুঁজি কিম্বা ফেস্বুকে কলকাতা দেখি। কিন্তু তুমি তো সব ছেড়ে এসে একবারও ফিরে যেতে পারনি ওপারের সেই সুন্দর ছবির মত গাছ গাছালিতে ভরা বাড়িটায়। তোমার বাড়ির একটা ছবিও তোমার কাছে নেই। তাইতো ভরসা করেছিলে আমার এই সাধারণ হাতের রঙ তুলিকে

আজ আমিও যে বহু বছর দেশ ছাড়া। এই দীর্ঘ সময়ের প্রবাস জীবনে হারিয়েছি আমার ছোড়দাকে, আমার মাকে, আমার মাসি, পিসি আরো কত মানুষকে। বছরের এই সময়টাতে তারা যেন আরো বেশি করে কাছে চলে আসে। আমার স্মৃতির বায়োস্কোপে তারা চলমান হয়ে দেখা দেয়। আজ আমার কাছে মহালয়া মানে নিছক মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠান বা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চন্ডী পাঠ নয়। শরতের অরুণ আলোয় ভরে থাকা আবছা ভোরে স্মৃতি বোঝাই ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে ভেসে বেড়ানো। ফেলে আসা সময়ের সেই মুহূর্তগুলোকে ছুঁতে চাওয়ার এক অসফল চেষ্টা। মহালয়া মানে তো আমাদের সেই গড়িয়ার বাড়ির একতলার বসার ঘরের রেডিওতে

সকলে মিলে আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে বড়দার হাতের চা খাওয়া। মায়ের কাছে দেশের বাড়ির গল্প শোনা কিংবা বন্ধুদের সাথে হাঁটতে যাওয়া। মহালয়া মানে তো ছোড়দার সাথে ইয়ার্কি করা। মহালয়া মানে পাড়ার পুজো প্রোগ্রামের মহড়ায় যাওয়া। আমার ছেলেবেলার সেই ট্র্যাডিশন্ এখনো চলছে---। না, এখন আমদের বাড়িটা বদলে গেছে। আমার বড়দা আর চা করতে পারে না। ছোড়দা অলোক, আজ থেকে দশ বছর আগেই আলোক পথের পাখী হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। আমার মা তার প্রিয় কৃষ্ণচূড়া গাছটা রেখে, সাজানো সংসার ফেলে মায়ের সেই দেশের ছবির স্বপ্ন চোখে নিয়ে গটগটিয়ে চলে গেছে দিনের শেষে ঘুমের দেশে। যাওয়ার সময় আমাকে একবারও ডাকেনি। একবারও বলেনি, 'বাবলি কৈ তুমি তো আঁকলে না সেই ছবি?'

আজ আমি আমার ছেলেবেলার সেই সকালটাকে হাতড়ে বেড়াই। আপন জনকে ছেড়ে সাত-সমুদ্র তের নদীর পারে, আমার ছেলেবেলার চেনা শরতের শিউলি ফোটা সকালকে পেছনে ফেলে উড়ে এসেছি এই সব পেয়েছির দেশে। এখানে এসে গড়েছি আমদের নতুন এক পৃথিবী। এখানে পেয়েছি অনেক। কিন্তু পেছনে ফেলে এসেছি যে শরতের সকালটা সেই দিনটা কি আর কোনদিন ফিরে পাব?

·•●❖●•·

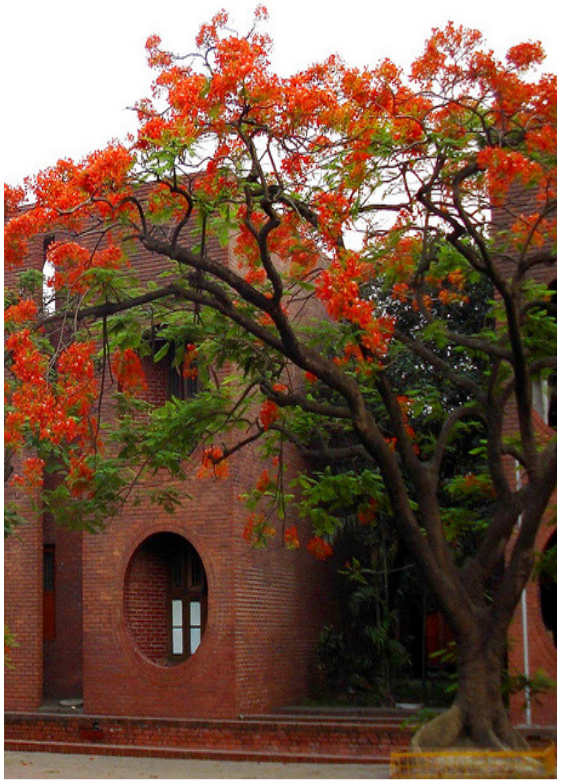

এক একটা দিন

উদ্দালক ভরদ্বাজ

এক একটা দিন তোমার, আর,
এক একটা দিন আমার।
এক একটা দিন ভয়ের, আর
এক একটা দিন ব্যথার।

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে,
সূর্য-বীথি নদীর চরে,
এক একটা দিন মেঘ সরে যায়
এক একটা দিন ভীষণ কাঁদায়।

তোমার বুকে, আমার বুকে,
অল্প আলোয়, অল্প সুখে,
যে সব কথা গড়িয়ে পড়ে-
এক একটা দিন ভুল সরে যায়।

ভুল সরে যায়, ভুল সরে যায়,
বীজ বোনে মন, অবুঝ মায়ায়-
এক একটা দিন স্পষ্ট বলেই
মেঘের চাদর হাওয়ায় মিলায়।

·•●❖●•·

সম্পর্ক

জয়শ্রী বাগচী

আজ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সুচেতার বড় অভিমান করতে ইচ্ছে করছিল।--- কিন্তু কার ওপরে? তার ছেলে-মেয়ে-বৌ-নাতি-নাতনি কেউই আর ধারে কাছে নেই, ডাকলেও সহজে এসে পৌঁছাতে পারবে না। আর স্বামী- সে-ই তো তার ওপর অভিমান করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে পাঁচ বছর আগে।

স্বামীর সঙ্গে সুচেতার সম্পর্ক কেমন ছিল- তা আজও সে ভাল বুঝতে পারে না। মাত্র স্কুলের গন্ডী পার হওয়া অষ্টাদশী সুচেতার ভাবনায় ছিল নিজের মতই ফর্সা টুকটুকে, ছিপছিপে একটা বর পাওয়ার- তাই সেই বিয়ের সময় থেকেই তার রোগা কালো বরকে পছন্দ হয়নি একটুও, আর তাই হয়ত প্রথম থেকেই সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল বরের কোনও কথা না শোনার বা না মানার। অবশ্য তাতে কোন সুরাহা হয়নি কোনদিনই, অগত্যা সেই স্বামীর সঙ্গেই তাকে কাটাতে হয়েছিল আজীবন মনের মধ্যে একরাশ দুঃখ, অভিমান, রাগ, বিতৃষ্ণা সবকিছু নিয়েই।

সংসারের স্বাভাবিক নিয়মে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের দাম্পত্য জীবনে এসেছিল একটি পুত্র ও পরে একটি কন্যা সন্তান। সন্তানদের পেয়ে সুচেতা যেন এক অন্য জগৎ খুঁজে পেয়েছিল। তাদের বড় করে তোলায় সে এমনই আত্মহারা ছিল যে তার মাঝে স্বামীর প্রতি সামান্য কর্তব্যটুকুও কখন যেন টুপ করে খসে পড়েছিল- আর সেকথা সে টের পেলেও তেমন আমল দেয়নি কোনদিনই। তাদের ওই দাম্পত্য কলহের মধ্যেই নিষ্পাপ দুটি শিশুমন একটু একটু করে বড় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। পাছে ওই পরিবেশ তাদের সরল মনকে কলুষিত করে দেয় তাই স্কুলে ভর্তির সময়েই বাবা তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিল হোস্টেলে। আর এই ঘটনাই সুচেতাকে সংসার ও স্বামীর বিরুদ্ধে আরও তিক্ত ও বিষময় করে তুলেছিল। বংশানুক্রমিক ধারায় ছেলে-মেয়ে দুটি খুবই মেধাবী ছিল- তাই স্কুল কলেজের গন্ডী অনায়াসে ভাল রেজাল্ট করে পার হয়ে চাকরি পেতে তাদের কোনও অসুবিধাই হয়নি। সন্তানদের মায়ের ছত্রছায়া থেকে মুক্ত করতে পেরে বাবা মনে মনে খুশি হয়ে শান্তি পেয়েছিল। আর সন্তান সাফল্যে গর্বিত মায়ের অবুঝ মন অনুধাবন করতে পারেনি বলে তাকে ঘিরেই বাবা ও সন্তানদের মাঝে এক অলিখিত বোঝাপড়া শুরু হয়েছিল সেই কবে থেকেই।

সময় তো আর বসে থাকে না, যুগ যুগ ধরে সে তার নিজস্ব গতি ও ধারায় এগিয়ে চলে একটু একটু করে, আর মানুষও চায় সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের জীবনের ছন্দকে বেঁধে নিতে, তাই যত মন কষাকষি বা বাকবিতন্ডা থাকুক না কেন সুচেতা ও তার স্বামী নিয়ম মাফিক সংসারের ঘটনাগুলোকে ঘটিয়ে চলেছিল একের পর এক যথা সময়ে। এজন্য অনেকবারই হয়ত স্বামীকে তার কাছে মাথা নত করতে হয়েছে বৈকি, শুধুমাত্র সংসারের শান্তিটুকু বজায় রাখার জন্যই- আর সেটাই স্বামীর পরাজয় মনে করে সুচেতা খুশি হয়ে উঠেছে বারে বারে।

এইভাবেই একদিন অনেক টানাপোড়েনের পর ছেলের বিয়েটাও তারা ঠিক করে ফেলেছিল এবং সর্বোপরি এঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী ও তৎসংক্রান্ত চাকরি সুচেতাকে আকৃষ্ট করেছিল খুব। সেই মুহূর্তে সে ভেবে নিয়েছিল বাকিটুকু ঠিক সে নিজের মতো করে গড়েপিটে তৈরী করে নেবে। ভুল- সমস্ত ভুল ছিল। না মেয়েটিকে পছন্দ করা নয়- কিন্তু তাকে তার আদর্শের বিরুদ্ধে গড়েপিটে নিতে চাওয়াটাই ছিল মস্ত বড় ভুল। আর তাই বোধ হয় যাকে সে নিজে পছন্দ করে বধূরূপে বরণ করে নিয়ে এসেছিল, সে যখন তার নিজস্ব আচার আচরণে ও বুদ্ধি বিবেচনায় সংসারের আরও তিনটি প্রাণীর মন জয় করতে শুরু করেছিল তখন সুচেতা যেন একটু ঈর্ষা বোধ করত। অবশ্য সে কথা সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারেনি শুধু এটুকু বুঝেছিল- যখন বৌ-এর কাজকর্মের সকলে প্রশংসা করত, কেন জানি না সে তাতে নিজেকে কিছুতেই সামিল করতে পারত না। তার বারে বারে মনে হ'ত বৌ যদি তার সঙ্গে পরামর্শ করে, তার মতো করে কাজ করত তাহলে হয়ত বা আরো ভাল হ'ত- আর এই বোধ থেকেই তার মনে জন্ম নিয়েছিল বৌ-এর বিরুদ্ধাচরণ করার এক প্রবণতা। বৌ-এর বিচার বিবেচনা, কাজ করার ধরন, ঘর সাজানোর পদ্ধতি- কোন কিছুতেই যখন সুচেতা এঁটে উঠতে পারছিল না, তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি তার মনকে গ্রাস করতে শুরু করেছিল। তবে কি সংসারে তার জায়গাটা নড়বড়ে হতে শুরু করেছে?--- ভেবেছিল একবার যদি বৌ রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে তাহলে তার চিরকালীন জায়গাটা চিরকালের জন্যই হারিয়ে যাবে। সংসারে তার কর্তৃত্ব ফলাবার জায়গা তো একমাত্র ওই রান্নাঘরটুকুই, সুতরাং শুরু হয়ে গিয়েছিল বৌ-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত। ছুটিছাটার দিনে চাকরির অবসরে বৌ সখ করে রান্না করতে ঢুকলেই সুচেতা এটা ওটা সরিয়ে ফেলত যাতে বৌ রান্নাটা কিছুতেই ঠিকঠাক না করতে পারে। বেচারা নতুন বৌ প্রথমে ধরতেই পারেনি এই খেলাটা। কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে সেও সচেতন হয়েছিল এবং স্বামী বা শ্বশুরকে কোনরকম অভিযোগ না জানিয়ে সে নিজেই তার সুরাহা করেছিল- রান্না করার আগেই মশলাপাতি গুছিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে। এই ঘটনায় সুচেতা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, বাইরে এক মিষ্টি ব্যবহারের আবডালে বৌ-এর বিরুদ্ধে নিজের মনকে হিংসা ও বিদ্বেষে ভরিয়ে তুলেছিল, যার প্রকাশ ঘটেছিল বৌ-এর প্রতি অনেক আচার আচরণে, তাকে খেতে দেওয়ায়, জামা-কাপড় কিনে দেওয়ায়, এমনকি তার আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে আচার ব্যবহারেও। অবোধ সুচেতা বুঝতে পারছিল না এইভাবে নিজেরই ছেলে-বৌ-এর মধ্যে কিসের বীজ সে বপন করে চলেছে- যা একদিন মহীরূহ আকার ধারণ করে ছেলে ও স্বামীকে তার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেবে। ইশ্, একথা যদি সে ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারত।

শুরু হয়ে গিয়েছিল ছেলে ও বৌ-এর বিদেশ পাড়ির পরিকল্পনা, বাবার পূর্ণ সমর্থনে। নিশ্চুপে সব আয়োজন সমাপ্ত হলে, চলে যাবার মাত্র দশ দিন আগে যখন সুচেতা সব জানতে পেরেছিল, তখন শুধুমাত্র চোখের জল ফেলা ছাড়া প্রতিবাদের আর কোন রাস্তাই খোলা ছিল না। সেই জল গায়ে মেখে বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ছেলে-বৌ রওয়ানা দিয়েছিল- অবশ্য যাওয়ার আগে ছেলে বলেছিল মাত্র তিন বছরের ব্যাপার। একটা বিদেশী ডিগ্রী হাসিল করেই তারা ফিরে আসবে মায়ের পাশটিতে।

তা কিন্তু হয়নি। আর হবেও না যে সেকথা সুচেতা কিছুদিনেই বুঝতে পেরেছিল। বৌ চলে যাওয়াতে যতটা খুশি সে হয়েছিল ঠিক ততটাই বিমর্ষ ছিল ছেলের জন্য। তবে কি সে ভেবেছিল নিজেদের দাম্পত্য জীবন যেমন দায়সারাভাবে তারা কাটিয়েছিল ছেলে-বৌ-এর বেলাতেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

এরপর সংসারের যে কোন কাজকর্ম ও ভাবনা চিন্তায় সুচেতার বিতৃষ্ণা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভর করেছিল পাশে থাকা মেয়ের উপরে। বাবা অনেক চেষ্টা করেও মেয়ের বিয়েটা ঠিক করতে পারছিল না সুচেতারই জন্য। আসলে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করাটাই ছিল তার একমাত্র কাজ। দেখতে দেখতে ওইভাবেই প্রায় পাঁচটা বছর পার হতে চলেছিল। এমনই একদিনে নানান বিষয়ে চরম ঝগড়াঝাঁটির পরে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে তার স্বামী তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হয়ত যার প্রচ্ছন্নে ছিল কিছু দুঃখ, অসহায়তা ও মনজোড়া একরাশ অভিমান। স্বামীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সুচেতা কতটা দুঃখী ও অসহায় হয়ে পড়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে তা সে বুঝতেই পারেনি- বরং ভেবেছিল এইবার সংসারে তার বিরোধিতা করার আর কেউ রইল না। এবার সে সত্যি সত্যিই স্বাধীন হয়ে নিজের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। তাই এক ফোঁটাও অশ্রু নির্গত না করেই পরম শান্তিতে সে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিল চরম নিয়ম নিষ্ঠায়, আর মনে মনে ভেবে নিয়েছিল এইবার নিশ্চয়ই ছেলে ওই লক্ষ যোজন দূরের সাত সমুদ্র, লক্ষ নদী পার হয়ে তার পাশটিতে এসে দাঁড়াবে।

আরো একবার সুচেতা যা ভেবেছিল তা হয়নি। ছেলে তখন ডিগ্রী হাসিল করে এক রিসার্চের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল, মেধাবী ছাত্রের কাছে এর চেয়ে বড় আকর্ষণ আর কীই বা হতে পারে? তাছাড়া বাবার ইচ্ছে পূরণ করাও ছিল তার জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য, এবং নিজে একটু থিতু হলেই সে মাকেও এই পরবাসে নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখতে পারবে আশা ছিল। মা অবশ্য এ যুক্তি মানতে পারেনি। বাস্তব জীবনের সমস্যা তখন একটু একটু করে তাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল। দৈনন্দিন জীবনের ছোটবড় খুঁটিনাটি বিষয়, চলাফেরার পাবন্দী, বিষয়-আশয় রক্ষণাবেক্ষণের জটিলতা এবং মাথার ওপরে অবিবাহিত মেয়ের বোঝা তাকে দিশাহারা করে তুলেছিল। এই সমস্ত ঝড়-ঝাপটা থেকে তার স্বামী তাকে আড়াল করে রেখেছিল এতদিন। এই প্রথম তার অভাব সুচেতা যেন অনুভব করতে পারছিল। সুচেতার খুব কষ্ট হচ্ছিল- সে কষ্ট কি তার স্বামীর অসময়ে মৃত্যুর জন্য, নাকি তাকে এতদিন বুঝতে না পারার জন্য, কিংবা আজকে তার এই অসহায় অবস্থার জন্য- সেকথা সুচেতা ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে ভাবছিল, তবে কি সে বৌ-এর কাছে তার ভুল স্বীকার করে নিয়ে তাকে কাছে ডেকে আনবে এই সংসারের হাল ধরার জন্য। অথচ মনে ভয়- যদি বৌ যদি রাজী না হয়! এইভাবেই আরো পাঁচটা বছর প্রায় অতিক্রম হতে চলেছিল, কোনও আত্মীয়-পরিজন পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বরং মেয়ের বিয়ে না দেওয়ার অভিযোগে বারবার তাকে অভিযুক্ত করে চলেছিল। এইসব নানান ভাবনায় সুচেতা যখন জর্জরিত তখনই একদিন ছেলে-বৌ-এর কাছ থেকে খবর পেয়েছিল মেয়ের বিয়ের আয়োজন করার জন্য। সুচেতা যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেনি, যা সে মেয়ের পাশে থেকে এতদিনে করতে পারল না, হাজার হাজার মাইল দূরে বসে বৌ কিভাবে তা করে ফেলতে পারল! যথাসময়ে বিয়ের নানান উপঢৌকন ও বিদেশী উপহার নিয়ে ছেলে-বৌ যখন উপস্থিত হ'ল সুচেতা আরো একবার খুশির জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিল। বিয়ের আয়োজন করতে করতে সে ভাবল এই বোধহয় ভাল হ'ল, স্বামী থাকলে এত সমারোহে মেয়ের বিয়েতে সে নিজের ইচ্ছে পূরণ করতেই পারত না। দূরের কাছের সব আত্মীয়ই সেই বিবাহযজ্ঞে উপস্থিত হ'ল- কেউ সত্যিই খুশি হয়ে, কেউ বা কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে। শুধু সুচেতাই তাদের কারো কাছে একবারের জন্যও স্বীকার করতে পারল না এই অনুষ্ঠানে বৌ-এর কতটা ভূমিকা। বরং বৌ যে তাতে উপস্থিত থেকেও নিজের কৃতিত্বটুকু তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারল না- সে কথা ভেবে আরো একবার নিজের জয় মনে মনে স্বীকার করে নিয়ে খুশি হয়ে উঠল।

ঈশ্বরই কি একটা সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিলেন? নইলে মেয়ের বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে এমন কঠিন অসুখে বিপর্যস্ত কেন? এই তো সবে স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ সে পেয়েছিল- যে রোগ ধরেছে তাতে সেরে ওঠার কোন লক্ষণই নেই।- বরং দিনে দিনে আরো অবনতির পথে সে এগিয়ে চলেছে। সে বারেবারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল একটা সুযোগ পাবার- যাতে নিজের সমস্ত ভুল শুধরে নিয়ে ছেলে-বৌ-এর কাছে গিয়ে একবারের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিতে পারে। হয়ত তাহলেই তার সমস্ত দোষ স্খলন হবে। সে-ই তো তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল যখন তারা আনন্দ করে নিজেদের কাছে সুচেতাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সুচেতা চায়নি বৌ-এর সংসারে গিয়ে তার অধীনস্থ হয়ে থাকা। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘোরের মধ্যে একদিন সে দেখল তার স্বামী যেন দূরে দাঁড়িয়ে তাকে হাত নেড়ে কাছে ডাকছে। সুচেতা ভাবল কিছুক্ষণ, কেন ডাকছে?--- সে কি তার শান্তি পাবার জন্য নাকি ছেলে-বৌ-এর শান্তির জন্য। ভাবতে ভাবতে সুচেতা ঘুমিয়েই পড়ল। ভোরের দিকে যখন একবার ঘুম ভাঙল মনে হ'ল ছেলে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। কাতর নয়নে সুচেতা যেন কিসের প্রতীক্ষায় এদিক ওদিক চাইল। এক দীর্ঘতম শ্বাস একটু একটু করে বার হয়ে এল--- ভালই হ'ল যাবার সময়তেও তাকে মাথা নিচু করে বৌ-এর কাছে ভুল স্বীকার করতে হ'ল না। ঈশ্বরই তাকে বাঁচিয়ে দিলেন আরো একবার, হয়ত এই শেষবারের মতন। ঘুমের কোলে একটু একটু করে ঢলে পড়ল সুচেতা।

মনে আছে মনে পড়ে না
অপর্ণা দত্ত

মনে আছে প্রথম স্কুলে যাওয়া,
মনে পড়ে না পাশে বসা সহপাঠীর নাম-
মনে আছে প্রথম ক্লাস-এ ওঠা,
মনে পড়ে না পাশ-না-করা বন্ধুটির কান্নাভেজা মুখ-
মনে আছে স্কুল পেরনোর পাশের খবর আসা,
মনে পড়ে না পাড়ার জ্যেঠুর নির্ভেজাল আনন্দ-
মনে আছে বেণী দুলিয়ে প্রথম কলেজ যাওয়া,
মনে পড়ে না পৌঁছে দিতে আসা মালতীদির অনাবিল হাসি-
মনে আছে প্রথম প্রেমে পড়া,
মনে পড়ে না অন্য সহপাঠী ছেলেটির ভালো-লাগা-মেশানো চাউনি-
মনে আছে প্রথম প্রেমের সম্মতি দেওয়া,
মনে পড়ে না প্রত্যাখ্যাত হওয়া ছেলেটির করুণ হেরে-যাওয়া মুখ-
মনে আছে নতুন জীবনে প্রথম পা রাখা,
মনে পড়ে না বিদায়বেলায় মায়ের চোখের ভাষা-
মনে আছে প্রথম মা হওয়ার আভাস,
মনে পড়ে না লজ্জা না আনন্দ-কে এসেছিল আগে মনের মাঝে-
মনে আছে প্রথম মা হওয়ার খবর,
মনে পড়ে না চোখ মুছিয়ে দেওয়া নাম-না-জানা নার্সটির কথা-
মনে আছে প্রথম নিজের সন্তানকে বুকে নেওয়া,
মনে পড়ে না পাশের ঘরে মৃত সন্তান প্রসব-করা দুঃখী মায়ের কান্না।

এই তালিকা অন্তহীন-
জীবনের কতটুকু মনে আছে আমাদের?
ঠিক ততটুকুই, যতটুকু আমরা মনে রাখতে চাই,
মনে রাখতে ভাল লাগে!
দুঃখকে আমাদের বড় ভয়,
না-পাওয়ার লজ্জা, হেরে যাওয়ার যন্ত্রণা আমাদের তাড়া করে-
আমরা ছুটছি, আমরা পালাচ্ছি-
দূরে, দূরে, আরো দূরে, অনেক দূরে-
কিন্তু কত দূরে?
নিজের কাছ থেকে কি পালানো যায়?

পথভ্রান্ত
মালবিকা সেনগুপ্ত

একটা কবিতা লিখব ভাবছিলাম
কিন্তু বিষয়টা খুব পরিষ্কার নয়
চারপাশের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে
এই ইন্‌ফরমেশন্ এক্সপ্লোশনের মধ্যে দাঁড়িয়ে
বিমূঢ়তা আমাকে গ্রাস করে।
টিভি বা ওয়েব্ খুললেই দেখতে পাই
চারপাশে ধ্বংসের লীলা চলছে,
মানুষ কখনো একা বা গোষ্ঠীগতভাবে
কেবলই আক্রান্ত হচ্ছে স্বদেশে, বিদেশে
অথবা স্যান্ডি নামক কোন প্রকৃতির বৈরিতায়।
সারা পৃথিবীতে হাহাকার চলছে অনন্তর
এটা কি হবার কথা?
তাহলে 'ঈশ্বর করুণাময়' কথাটা কি কেবলই
ছেলে-ভুলোনো ছড়া?
কারণ খুঁজতে গিয়ে নিজের দিকে তাকাই
এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই যে ফার্স্ট হবার
খেলায় সামিল হয়ে গেছি।
তারপর যত বয়স বাড়ল, চেতনা প্রবল হ'ল
ততই নিজেকে জেতানোর, অপরকে ঠকানোর-
মানুষের সর্বনাশের মন মাতানো খেলায়
মত্ত হয়ে গেলাম।
আর ফেরার উপায় নেই, কারণ খেলা জমে উঠেছে
নিজেকে দুর্দান্ত বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে,
মন্ত্রের মতন বলে চলি-
এ জীবনটা কেবল পাবার জন্য, কেবল নেবার জন্য,
খালি পেতে হবে, আরো নিতে হবে,
কিন্তু দিতে হলেই আমি বুদ্ধিহীন হয়ে যাব।
যত পারি মানুষকে, প্রকৃতিকে, পারিপার্শ্বিককে
তিল তিল করে শুষে নিয়ে সফল জীবনের উন্মাদনায়
নিজেকে হারিয়ে ফেলি।
এর মধ্যে হঠাৎ শুনি নবমীর দিন সুনীল নেই,
মুহূর্তে সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়,
উন্মত্ত জীবনের উন্নাসিকতায় বাধা পড়ে,
ক্ষণিক জীবনের ভঙ্গুরতা তীব্র হয়ে
আঘাত করে অন্তরের গভীরে।
একবার কি থমকে দাঁড়াই?
একবারের জন্য কি ভেবে দেখি
কোথায় চলেছি আমি?

কবিতা লিখব, আমি? কেমন করে?
আমি কি কবিতা লিখতে জানি?

কী করে আশাবাদী হওয়া যায়

মৃণাল চৌধুরী

যাঁরা সবসময় অনুযোগ অভিযোগ করে থাকেন, তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে কোনভাবেই সুখী হতে পারেন না। এটা কিন্তু ধ্রুব সত্য। তবে এটা নয় যে জীবনের পথে চলতে গেলে কোনকিছু বা কারও প্রতি কোন অনুযোগ অভিযোগ থাকবে না। সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। এই অভিযোগ অনুযোগের ধারাটাকে কীভাবে চালনা করবেন সেটাই আসল কথা। বেশ কিছু লোক আছেন যাঁরা এই অভিযোগ অনুযোগ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারেন না। তাঁরা মনে করেন, কোন কিছুই ঠিক নয়। তাই অন্যকে ছোট করে দেখা, অন্যকে নীচে নামিয়ে দেওয়াই তাঁদের কাজ। কিন্তু তলিয়ে দেখলে এটা স্পষ্ট হয় যে তাতে করে এই ছোট মাপের মানুষরা অন্যকে গর্তে নামাতে গিয়ে নিজেরাই গর্তে ডুবে যান। আমি তাই মনে করছি, আমি সেই গর্তে ডুবছি না।

আমাদের জীবনে নিশ্চয়ই এমন সময় আসবে যখন কিছু বিপদ, শারীরিক অসুস্থতা, মৃত্যু, আর্থিক দুরবস্থা, পারিবারিক অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ আসবেই। এমন কেউ নেই যিনি এইরকম অবস্থার মধ্যে যাননি বা যাবেন না। এই অবস্থায় নেতিবাচক আবেগ থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই সহজ নয়। এই রকম অবস্থায় ভাল হচ্ছে এই আবেগটা প্রকাশ করে নিজেকে মুক্ত করা। সেটা ভেতরে রেখে গুমরে মরা অতি অনিষ্টকর। সবচেয়ে সহজ উপায়ে সেটা প্রকাশ করে সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া উচিত। কিন্তু এই অনুভূতি ভেতরে রেখে দেওয়ার একটা সময় সীমানা করে রাখা ভাল, তা না হলে এই না-সূচক অবস্থাটা সারা জীবন আঁকড়ে থাকবে।

ইতিবাচক প্রতিবেদন

জীবনের ভাল ও সুষ্ঠু দিকটা দেখতে গেলে অনেক বেশী প্রয়াস ও চেষ্টার প্রয়োজন হলেও একজন আশাবাদী লোকের কাছে এর পুরস্কার অনেক বেশী। যা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে, উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে নিজেকে সেই উদ্বেগ থেকে আস্তে আস্তে মুক্ত করার প্রয়াসটা শিখতে পারলে পরে সেটা অভ্যেসে পরিণত হয়, মগজে ঢুকে যায়। তখন জীবনের চারদিকে যা কিছু আছে তাতেই আনন্দ পাওয়া যায়। তা না করে একটা নেতিবাচক চিন্তা বা অবস্থাকে সবসময় ঢুকিয়ে রাখলে একটা কালো মেঘ জীবনকে তাড়া করে বেড়ায়। কোন অবস্থার সতত খারাপ দিকটা চিন্তা করতে থাকলে সুযোগ হারাবার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশী আর সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যায় কমে। আর সময়মত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অভাবের ফলে আন্তঃসম্পর্ক ও জীবনের উৎকর্ষতা যায় কমে। এটা গবেষণা করে দেখা গেছে যে নৈরাশ্যবাদীরা আশাবাদীদের তুলনায় জীবনের শেষের দিকে নানা ধরনের রোগে ভোগেন। নেতিবাচক লোকদের সবসময় খারাপ দিকটা চিন্তা করার ফলে লক্ষ্যটাকে অপসারণ বা স্থানান্তরিত করতে পারেন না। কিন্তু এটা তো ঠিক, খালি গ্লাসের অর্ধেকের বদলে পুরো গ্লাসের অর্ধেক থেকে শুরু করা অবশ্যই সম্ভব। উপরন্তু এটাই মনে করা ঠিক যে, গ্লাসটা সাধারণতঃ ভর্তিই থাকে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটা কেবল তরল পদার্থটাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

জীবনের এই ইতিবাচক দিকটাকে লক্ষ্য করে, সেইরকম মনোবৃত্তির লোকজনের সান্নিধ্যে থেকে জীবন চালনা করলে পথটা অনেক মুখর, স্বচ্ছ ও সহজ হয়ে ওঠে। এসব কথা ভেবে নীচে কতকগুলো সহজ ভাবনা ও পদ্ধতির কথা উল্লেখ করছি:

- মনে মনে ভাবতে হবে সবকিছুই সম্ভব।
- জীবনটা সত্যি ছোট ও সহজ।
- আমার অবস্থা আমাকে তৈরী করেনি, আমিই আমার অবস্থাটাকে তৈরী করি।
- আমি অন্য কিছু বদলাতে না পারলেও আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব অবশ্যই বদলাতে পারি।
- আমার কাছে সবসময় বেছে নেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার আছে।
- আমি নেতিবাচক ভাবনা মুক্ত ইতিবাচক জীবন ধারণ করতে চাই।
- অতীতকে কখনই ভবিষ্যতের মত করে ভাবা উচিত নয়।
- নিজেকে ভাবা উচিত কারণ হিসাবে, পরিণাম বা ফল হিসাবে নয়।
- সদা ইতিবাচক উক্তি বা জীবন ধারণ করব, তবে অবশ্যই তার ভারসাম্য থাকা উচিত।

(আমার এই লেখাটা মৌলিক নয়, আশাবাদ ও নৈরাশ্যবাদের ওপর কিছু লেখা পড়ে ভাবনাগুলো মাথায় ঢুকেছিল। সেই সূত্র ধরেই ভাবনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছি মাত্র, কিছুটা নিজের জন্য, তার সঙ্গে কিছুটা অপরের জন্য।)

কেউ চায় কেউ চায় না

রঙ্গনাথ

'সোনা নেবে?' এক পাখীকে প্রশ্ন করলাম।
সে আড়চোখে বলল, 'সোনা কী, কেমন?'
'এই ভারি-উজ্জ্বল টুকরোগুলো খুব দামী
বাসা দেখাবে সুন্দর এ দিয়ে সাজাবে যখন।'
পাখী বলল, 'ওতে তো আমার কাজ নেই
অত মহামূল্য সোনা নিয়ে ঘুমাবো কী করে?
খড়-কুটোর বাসা খুব ভাল, অতি সাধারণ
কিছু হারাবার নেই, ঘুমাতে পারি রাত'ভরে।'

এক সিংহকে বললাম, 'খাবে, খাবার এনেছি?
দেখ, অনেক আছে, যা চাও তাই তুমি পাবে
ভাত, ঝালের মাংস, মিষ্টি, ঘিয়ে-ভাজা পিঠা-
আর দৌড়াতে হবে না, আরামে সময় কাটাবে।'
'হুম! অত খেয়ে মোটা-সোটা হই- এই চাও?
চাও হৃদরোগে ভুগি, বাতের ব্যথায় কাতরাই?
তুমি ওষুধ পাও, আমার তো তা মিলবে না
রোগ নিয়ে, বসে-শুয়ে থেকে বাঁচার সখ নাই।'

জীর্ণ-শীর্ণ গৃহহীন লোকটিকে কাছে ডাকলাম,
'সবকিছু বিনামূল্যে পাবে, তুমি যা চাও, নাও।'
সে খুঁজতে থাকল; শেষে নিল একটু খাবার।
'একি, কিছুই নিলে না; কেন নিতে নাহি চাও?'
বলল সে, 'এক রাতের জন্য এই তো অনেক'!
সে কি সিংহের মত রোগাক্রান্ত হতে না চায়?
সে কি পাখীর মত নির্ভয়ে ঘুমায় রাত'ভর?
না চেয়ে, না পেয়ে, সে কি করে দিন কাটায়?

ব্যস্ত এক মানুষকে বললাম, 'কোন কিছু চাই?'
'নিশ্চয়! জীবন-যুদ্ধে হাবুডুবু, যা দিবে দাও-
বিদ্যা-বুদ্ধি, সোনা-দানা, বাড়ি-গাড়ি, চাঁদা-ঘুষ,
স্বাস্থ্য-শান্তি- খুশি হব যদি সবকিছু পাই ফাও।'

চার বুড়ো

নন্দিতা ভাটনগর

বাড়ির সামনে একটা 'রিটায়ারমেন্ট হোম'- অস্তাচলগামী মানুষদের শেষ পর্যায়ের আস্তানা। সুন্দর কেয়ারি করা বাগানের একটা বেঞ্চিতে বসে থাকে চারজন বুড়ো মানুষ- রোজ দেখি তাদের। বসে থাকে সকাল সন্ধ্যায় নিয়ম করে। সময়ের নড়চড় হয় না কখনও। কিন্তু ওরা কথা বলে না। চারজন বসে থাকে চারদিকে মুখ করে। পরস্পরকে যে ওরা চেনে তেমন কোন প্রমাণও পাই না ওদের এই অদ্ভুত ব্যবহারে। তবু ওরা একসঙ্গে, ওই বেঞ্চিতে বসে থাকে দিনের পর দিন।

একদিন এল আমন্ত্রণ ওই 'হোম'-এর তরফ থেকে, এক বান্ধবীর মাধ্যমে। চীনদের সম্পর্কে কিছু বলতে হবে হালকা কথায়- স্লাইড্ অথবা ভিডিও দেখিয়ে। কিছু আবাসিক আজ স্থানু হয়ে গেলেও এককালে ভ্রমণের নেশায় মেতে থাকতেন। তাঁরা এখনও দিগন্তটাকে ছুঁতে চান- চোখ দিয়ে, মন দিয়ে। বুঝলাম তাঁদের মন আজও স্থবির হয়ে যায়নি। বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে চোখগুলোকে দেখে নিজের পড়ন্তবেলা সম্পর্কে ভয়টা কেটেও গেল খানিকটা। বেরিয়ে আসার সময় আবার দেখলাম সেই বুড়োদের- শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে চারজন চারদিকে।

এবার পেলাম আমার কৌতূহলের হদিস আমার বান্ধবীর কাছ থেকে- ওদের দুজনের স্ত্রী মারা গেছে গত বছরে। অন্য দুজন সঙ্গিনীদের হারিয়ে ফেলেছে আলজাইমারের অতল গহ্বরে। থাকে তারা এই হোমেরই আর একটা বিশেষ অংশে। স্বামীদের চিনতেও পারে না, তবু এরা প্রতিদিন যায় নিয়ম করে।

প্রশ্ন করি আমি, -কিন্তু ওরা কি পরস্পরকে চেনে না কিংবা পছন্দ করে না? না, তা কেন, একদিন তো রীতিমত প্ল্যান করেই চার বন্ধু এসেছিল এখানে, অবসরপ্রাপ্ত জীবনে পরস্পরকে সঙ্গ দেবার জন্য। সঙ্গিনীদের হারিয়ে ফেলার পর থেকে ওদের এই অবস্থা। একটু থেমে বান্ধবী বলে, -অবাক হই আমরা। কথা বলেও তো ওরা একাকীত্বের ভার নামাতে পারে।- শুনে অবাক হই আমিও। কিন্তু রাস্তা পার হতে হতে পিছন ফিরে ওই চার বুড়োকে দেখতে গিয়ে হঠাৎই মনে হ'ল- কী করেই বা কথা বলবে ওরা! একাকীত্ব যে বোবা; শূন্যতার কোন ভাষা নেই।

ভদ্রলোক

প্রভাত কুমার হাজরা

অল্পদিন হ'ল নিত্যানন্দ ঘোষাল আমাদের জেলা কাছারিতে এস.ডি.ও হয়ে পৌঁছেছেন। আমি ওকালতি করি। ওঁর এজলাসে প্রথম সওয়াল করার দিন ওঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেদিন এজলাস শেষ হবার পরে উনি আমাকে ডাকলেন। বেশ অমায়িক লোক, লোকের সঙ্গে সহজে আলাপ করে নিতে পারেন। বিশেষ ভূমিকা না করে আগামী রবিবার আমাকে ওঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। ওঁর দাবা খেলার ভীষণ সখ। বললেন ওঁর বাড়িতে আমার সঙ্গে দাবা খেলতে পেলে উনি খুব খুশি হবেন। উনি শুনেছেন আমি ভাল দাবা খেলতে পারি। কার কাছে শুনেছেন তা বললেন না- তবে আমি ভাল দাবা খেলতে পারি। দাবা খেলা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছি কয়েকবার। যাইহোক, ভালই হ'ল, সঙ্গীর অভাবে আমিও দাবা খেলার সুযোগ পাইনি অনেকদিন।

সেই থেকে প্রায় প্রতি রবিবার ওঁর বাড়িতে দাবা খেলতে যাই। প্রথম দিন যাবার আগে Bodvenic, Alekhine, Loskor প্রমুখ দাবা খেলোয়াড়দের ভাল ভাল চালগুলো ঝালিয়ে নিয়ে গেছিলাম। বিপক্ষকে তুচ্ছ করা ঠিক হবে না এই ভেবে, কিন্তু দেখলাম নিত্যানন্দবাবু দুরন্ত খেলোয়াড়। মনে আছে সেদিন উনি পর পর তিনবারই আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য আমরা দুজনেই সমান পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। সেইজন্য শুধু একবার খেলাতেই সারা রবিবার চলে যায়।

আজ রবিবার। আমাদের দাবা খেলার দিন। নিত্যানন্দবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখলাম উনি বাড়িতে নেই, ঘন্টা খানেক পরে ফিরবেন। অবশ্য দোষটা ওঁর নয়, আমিই একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছেছি। নিত্যানন্দবাবুর বাড়ির কাজ করার লোক দামোদর আমাকে বসতে বলল। তারপরে এক কাপ চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনতে পেলাম বাড়ির ভেতর থেকে আসা মীনাক্ষীর গলা। মীনাক্ষী নিত্যানন্দবাবুর পাঁচ বছরের মেয়ে। বাবা মা ওকে আদর করে মীনা বলে ডাকেন। আমিও ওই নামেই ডাকি ওকে। প্রথম দিন ও নিজে ওর দুটো নামই উল্লেখ করে পরিচয় দিয়েছিল আমার কাছে। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর দুটি নামের মধ্যে কোন নামটি সবথেকে ভাল। বিষয়টি ও ভেবে দেখেনি এর আগে। মজার প্রশ্ন। শুনে খুশি হয়েছিল, তারপর একটু ভেবে উত্তর দিয়েছিল- 'আমার দুটো নামের মধ্যে দুটোই সবথেকে ভাল।' কিছুদিন পরে ও আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল যে আমারও দুটো নাম আছে কিনা। আমি বলেছিলাম 'হ্যাঁ।' তারপরে ও প্রশ্ন করেছিল- 'তোমার দুটো নামের কোনটি সবথেকে ভাল?' আমি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম- 'মীনা, তুমি আমাকে যে নামে ডাকো সেই নামটিই সবথেকে ভাল।'

মীনা আমার সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। কিন্তু আমি যতক্ষণ ওদের বাড়িতে থাকি তার সবটুকু সময় চলে যায় আমাদের দাবা খেলায়। আর দাবা খেলা শেষ হলে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না, বাড়ি ফেরার সময় হয়ে যায়। তাই ভাবলাম আজ যখন সময় পেয়েছি তখন মীনার সঙ্গে একটু ভাল করে গল্প করি। দামোদরকে ডেকে বললাম মীনাকে ডেকে দিতে। বাড়ির ভেতরে গিয়ে দামোদর সেই কথাই বলল। নিত্যানন্দবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন কে এসেছেন। দামোদর আমার নামটা ঠিক মনে করতে পারল না, বলল, 'একজন ভদ্রলোক এসেছেন, মীনা দিদিমণিকে ডাকছেন।'

বসার ঘরে বসে আমি শুনতে পাচ্ছি বাড়ির ভেতরে মা আর মেয়ের কথোপকথন। নিত্যানন্দবাবুর স্ত্রী মেয়েকে ভাল করে না সাজিয়ে বাইরে আসতে দেবেন না। মেয়ে কিন্তু আব্দার আপত্তি করছে, বলছে- 'এখন আবার সাজগোজ করতে হবে কেন?' মা বলছেন- 'বাইরে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তোমাকে ডাকছেন, একটু সাজগোজ না করে বাইরে গেলে উনি কি ভাববেন?' তারপর চুপচাপ, কিছু শুনতে পাচ্ছি না, তবু আন্দাজ করতে পারছি বাড়ির ভেতরে কি হচ্ছে এখন। এবার লাল ফিতে বা সবুজ ফিতে দিয়ে মা মেয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন। কানে দুল পরিয়ে দিচ্ছেন। মেয়ের কপালে টিপ পরিয়ে দিচ্ছেন। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে হয়ত মনে মনে বলছেন ভারি মিষ্টি মেয়ে আমার।

এখন সাজগোজ হয়ে গেছে মীনার। দামোদরের হাত ধরে ও যখন বসার ঘরে ঢুকল তখনও ওর চোখে মুখে কৌতূহল। বাইরে কে এসেছে ঠিক জানে না। কিন্তু আমাকে দেখে ও আমার কাছে ছুটে এল। তারপর একগাল হেসে বলল,- 'ও মা, এ তো হরিপদ জ্যেঠু। ও আবার ভদ্রলোক হবে কি করে?'

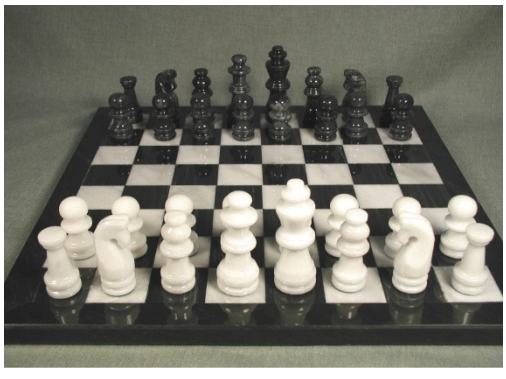

প্রতিবাদ
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

কাদম্বরী মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন,
তিনি মরেন নাই।
কত ভাগ্যবতী ছিলেন তিনি
কবিগুরুর কাব্যে তিনি অন্তত
কিছু প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আজকের সেইসব
অসহায় নারী, যাঁরা নির্দয়ভাবে
ধর্ষিতা হয়ে প্রাণ দিচ্ছেন-
তাঁরা কি প্রমাণ করতে পারছেন
এই সমাজে নেই কোন শাসন ব্যবস্থা,
আছে শুধু অসীম লাঞ্ছনা ও অপমান!

যারা আজ নির্দয়ভাবে
নারীভ্রূণ হত্যা করছে
তাদের নেই কোন শাস্তি,
তাই তারা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
পারবে কি কোন সাহসী মানুষ
এদের সকলকে এক এক করে
ধরে নির্বীজ করে দিতে?
পারবে কি এইসব পুংলিঙ্গদের
ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করতে?

আমি জানি একদিন আসবে-
সেদিন সাধারণ মানুষ নিজেরাই
তুলে নেবে শাস্তির ভার।
আর সেইদিনই আসবে
মা বোনেদের সম্মান ও
বেঁচে থাকার অধিকার।

মাঝি
রঙ্গনাথ

খেয়া ঘাটের মাঝি, করি নদী পারাপার
একূল হতে ওকূল, ঘাট থেকে ঘাটে;
শাল কাঠের নৌকা আমার শক্ত-কঠিন
বড় মজবুত, সহজে ভাঙবে না জানি।

ভাদ্র থেকে জ্যৈষ্ঠ-
নৌকা রয় লোকজন মালামালে ভরাট
শান্ত নদীতে নির্ভয়ে তা নিয়মিত চলে
জল এপাশ-ওপাশ করে ওপারেতে ধায়
এ যেন মস্ত এক ডানাহীন চলন্ত পাখী।

আজ আষাঢ়ের একদিন-
নদী ভরে গেছে, বর্ষার ওকূল বহুদূরে
উঁচু উঁচু ঢেউ, দুরন্ত স্রোত, ঘূর্ণিপাক
এটা-সেটা কত কিছু ছুটে ছুটে আসে।
বিজলীর চমকানি, কালো মেঘের হুঙ্কার
এর মাঝে আমার নৌকা যাবে ওপারে
মাঝি আমি।
ঘাটে আছে মাত্র চার জন
তারা যাবে কি যাবে না চিন্তায় ব্যাকুল।
বললাম, ‘বাবুগণ, নৌকায় ভয় নাই।’
দুজন বলল, ‘মাঝি, সাহস পাই না’;
অন্য দুজন তাকাল এদিক ওদিকে,
প্রশ্ন করল, ‘সাহস কি দিতে পারো?’
বলল, ‘নৌকা ডুবে মরতে না চাই।’
বললাম, ‘কাউকে কি সাহস দেওয়া যায়?
এ যে চিত্তের প্রতাপ, নিজের সম্পদ।’
বললাম, ‘আমায় ওপারেতে যেতে হবে,
ঢেউয়ের সাথে নৌকার হবে কোলাকুলি;
পাল তুলে যাব, এ দু হাতে ধরব হাল
নৌকা অক্ষত রবে; ঠিক, ঠিক চলে যাব।’

দুজন নৌকায় এল, দুজন পিছিয়ে গেল
নৌকা ছাড়লাম, চললাম, গেলাম ওপারে।
পিছনে নদী চলছে, তাকে বিদায় বললাম;
সেও এক কড়া ঘূর্ণি দিয়ে বলল ‘সাবাস’।

দু মাস এমনটা ঘটবে, নদী রবে ভয়ঙ্কর;
আমার নৌকায় সাহসীরা যাবে ওপারে,
আজ যারা ভীতু, তারা কাল যদি আসে
সাহস যদিবা পায়, তারাও ওধারে যাবে।

(বাহাদুরদাকে স্মরণ করে। আমার ভরা
নদীতে নৌকা পারাপার তাঁর কাছে শেখা।)

স্বপ্নবিলাস
সুজয় দত্ত

কাল সারারাত দেয়া গরজে
শুনি ঝরে বারি ঝরোঝরো যে।
আজি চোখ মেলে দেখি প্রভাতে
ধরা সেজেছে অমল শোভাতে।

মেঘ সরছে, আলো ঝরছে,
মোর হৃদয়পেয়ালা ভরছে।
ঢেউ উঠছে, ফুল ফুটছে,
কত ভ্রমরায় মধু লুটছে।

যূথীকুঞ্জে শুনি গুঞ্জে
করে মুখরিত অলিপুঞ্জে।
বনবীথিকায় মধু গীতি গায়
বসে যুগলে শুক-সারিকায়।

আর এরই মাঝে ক্ষণে-ক্ষণিকে
মনে উতরোল তোলে জানি কে।
আছি একাকী, পাব দেখা কি
তার আধো-নিমীলিত সে আঁখি?

সে তো ছিল মম হৃদিমাঝারে,
কেন দিল এ কঠিন সাজা রে?
করি সহসা বাঁধন ছিন্ন
কেন পথ খুঁজে নিল ভিন্ন?

এই ভাবনায় দিবানিশি যায়,
জেগে থাকি বুকভরা বেদনায়-
যদি একবার, শুধু একবার
কভু পথ ভুলে আসে মোর দ্বার।

আমি তারি আশে ছিনু মগ্ন।
কাল হঠাৎ কী শুভলগ্ন!
দেখি আধোঘুমে আধো-আঁধারে
আমি তার বাহুডোরে বাঁধা রে!

মম প্রিয়রে হেরি শিয়রে
আহা লাগে কিবা রমণীয় রে!
মৃদু পরশে সুধা বরষে,
দেহে শিহরণ জাগে হরষে।

সে তো গিয়েছিল দূরে হারিয়ে,
মোর অনুনয় পায়ে মাড়িয়ে।
আজ ফিরে এলো সে কি অকারণ?
আর হারাবো না তারে এ-জীবন।

হায় তখনি সহসা ভাঙে ঘুম,
দেখি চারিপাশে রাত নিঃঝুম।
নেই কেউ নেই মম শয্যায়
লাজে কুণ্ঠিত বধূসজ্জায়।

ছিল সবই স্বপনের ছলনা।
তবু সে কথা আমারে বোলনা।
নিয়ে হৃদয়ে বাসনা গুপ্ত
আমি যুগে যুগে রব সুপ্ত-
এই মধুর স্বপন-মায়াজাল ভেঙে
এখনি জাগিয়ে তুলনা।

·•●❖●•·

অন্তরতম
কমলপ্রিয়া রায়

অন্তরের অন্তঃস্থলে নীরবে নিভৃতে
তব বাঁশি বাজে,
তব গান, তব বাণী, তব সুর-
সদা বাজে মোর হৃদয়ে,
কত আনন্দে, কত কাজে,
কত দুঃখে, কত সাজে।

সেই সঙ্গীত সাথে লয়ে
কত যুগ পার হয়ে এলাম-
আজি এই জীবনের সান্ধ্যগগনে
এসে ভাবি কী পাইনি আর কীই বা পেলাম।

এ হিসাব মেলে না জাগরণে,
এ হিসাব মেলে না শয়নে।
সব হিসাবের শেষে শুধু এক আশা,
সে তোমার আশিস্, সে তোমার ভালবাসা
জীবন ধন্য হবে তোমার আশ্বাসে-
সেই মোর পরম প্রাপ্তি যা অন্তর-গভীরে বিকাশে।

·•●❖●•·

নোনাজলের পদ্মদীঘি

এস. এস. নেওয়াজ

পৌষ মাসের রাতের বেলা গোলপাতার ঘরের ফাঁকে ফাঁকে ঠান্ডা বাতাস হি হি করে ঢুকছে। কনকনে এই ঠান্ডা বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত আশেপাশের ঝুপড়িগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। পুকুর পাড়ের আমড়া আর চালতা গাছগুলোও মনে হয় খুলনা শহরের এত ঠান্ডা কখনো দেখেনি। টুটপাড়ার কবরখানার সামনের লাইটটা পর্যন্ত বাতাসে হি হি করে কাঁপছে। এমন রাত্রে মরণ বাঁচন সমস্যা ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে বেরবে না। বারান্দার খাটে মশারির নীচে রোদে-গরম-করা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে খুব মজা আজ রাতে। মশাগুলোও মনে হয় এই ঠান্ডায় মানুষের রক্ত চোষার অনুপ্রেরণা হারিয়ে ফেলেছে। তবুও কোথা থেকে এক একটা মশা মশারির ছেঁড়া ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পিন পিন করে ডেকে যাচ্ছে অনবরত। ভাগ্যিস লেপটা নাক-কান পর্যন্ত ঢাকা, নাহলে এমন রাতেও আসাদের ঘুমের বারোটা বেজে যেত।

রাতের এই স্তব্ধতা চূর্ণ করে নিম গাছটার তলা থেকে ডাক এল- মন্না, ও মন্না বাড়িতি আছ? বার দুয়েক চিৎকারের পর কার বাপের সাধ্যি আর ঘুমায়? আসাদ উঠে পড়ে, - কে? কে ডাকতিছ এ এত রাত্তিরি?
অপরিচিত স্বরটা উত্তর দেয়- আমারে চেনবেন না, আমি রফিক খোনকারের বাড়িতি কাজ করি। তাদের মেয়ে পোয়াতি, ব্যথা উঠিছে, একেবারে মরে যাওয়ার মতো, মন্নারে নিয়ে যাতি কইছে এহনি।

এমন আহ্বান কিছু নতুন নয়। মনমত দাসী, সংক্ষেপে মন্না, এ অঞ্চলের তিন চার মাইলের মধ্যে নাম করা ধাত্রী। বেরিয়ে এসেছে মন্না। একটা সাদা থানের শাড়ী পরা, গায়ে জড়ানো কালো সুতীর আলোয়ান, সাকুল্যে পাঁচ ফুট লম্বা- হাতে ধরা সদা বর্তমান রূপোর একটা তামাক গুঁড়োর ছোট কৌটো। মুখের অজস্র ভাঁজে মনে করিয়ে দেয় তার বয়সের পরিমাপ।
- কহোন ধরে ব্যথা উঠিছে? প্রশ্ন করে মন্না।
- তা কতি পারব না, আমারে শুধু কলো মন্নারে যাইয়ে এহনি ডাকে নিয়া আসপি। হ্যারিকেনের উস্‌কে দেওয়া আলোয় বছর পনেরোর ছেলেটার মুখ দেখা যায়। -তাই দৌড়িতে দৌড়িতে আইলাম।
- চল তাহলি। এহন আর রিকসা পাওয়া যাবিনানে, হাঁটেই যাতি হবেনে।

মানুষের জীবনটা তার অভিজ্ঞতার সমষ্টি। আসাদের যেসব মানুষের সাথে পরিচয়ের ও সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে, মন্না হচ্ছে তার এক অভিনব উপমা। চল্লিশের মন্বন্তরের সময় এক হিন্দু বাল-বিধবা কোন সূত্রেই বা যশোরের কালিয়া থেকে খুলনার এক মুসলমান পরিবারে এসে সারা জীবন কাটিয়ে গেল, সে রহস্য অজানাই থেকে যাবে। কিন্তু আসাদের নানার বাড়িতে হরেক মানুষের যাওয়া আসা; কেউ বা আসে দুদিনের জন্য, কেউ ম্যাট্রিক পাশ করে ধোপাখালি, কান্দাপাড়া, কাঠিপাড়া থেকে এসে থেকে যায় মাসের পর মাস চাকরির খোঁজে। কারুর হাতে সবেদা, কামরাঙ্গা বা পাকা কাঁঠাল, না হয় ফকির হাটের নামকরা জাম বা জামরুল। এরা সবাই আসাদের পাতানো মামা হয়ে যায়- যেমন গেঁদুমামা, দাউদমামা, খোকনমামা।

এমনই এক প্রায় পরিচয়হীনা আশ্রিতা হ'ল রাঙ্গাখালা। কোথায় কোন সময় আসাদের নানার কোন গ্রাম সম্পর্কের খালাতো বা ফুফাতো বোনের মেয়ে সে। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে, বাপ আবার বিয়ে করে লাপাত্তা। রাঙ্গাখালা বড় হয়ে উঠেছে আসাদের নানার আশ্রয়ে। রাঙ্গাখালা আসাদকে ডাকে- পট্‌কা, তার একটা কারণও আছে। মন্না আর রাঙ্গাখালার কাছে আসাদ তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনেছে বহুবার। রাঙ্গাখালার ভাষায়- তুই ছিলি প্রিমি, আধা গজ কাপড়ে তোর তিনটা জাঙ্গিয়া বানাইছিলাম- তাও হ'ল লম্বা। মন্নার ভাষায়- তোর মা ছিল সাত মাসের পোয়াতি তহন। বাঁচার কোন আশা ছিল না তোর। ওই যে তোর সুলতান নানা, সে সন্ধ্যেবেলা মোম জ্বালায়ে উঠানে জিকির করেছে রাতের পর রাত। এক কালো হাত আসে বারবার সেই মোমগুলি নিভায়ে দেত। তারপর একদিন মোম আর নিভল না, তুই বাঁচে গেলি। সেই বাঁচা-মরার টানাপোড়েনে আসাদের বেড়ে ওঠা নানার বাড়িতে। বাড়ির প্রথম দৌহিত্র। খান জাহান আলির দরগাহ থেকে আনা তেল-পড়া, পানি-পড়া দিয়ে দৈনিক গোসল করা, নানারকমের নিয়ম আর বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়, শনি, মঙ্গল বারে বাড়ির কারুর মুসুরির ডাল খাওয়া চলবে না, সপ্তাহে দুদিন হরতুকি, উদুখলের বিচি ভিজান আর তার সাথে হুক্কার পুরানো পানি খেতে হয়- তাতে নাকি বমি বন্ধ থাকে। সকালে নিয়ম করে খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসে হাঁটতে হয়- এতে নাকি ক্যালসিয়াম বাড়ে। তার সাথে ছিল গলায়, কোমরে, হাতে নানা কিসিমের হরেক রকম তামা ও রূপার মাদুলি। এ রকম কঠিন নিয়ম আর অনুপান মেনে তাকে যে আসাদের মায়ের পক্ষেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েই নানার আদেশে আসাদের নানার বাড়িতে বড় হওয়া বহাল হ'ল। মা তার বাবার সাথে চাকরি স্থলে, প্রথম ছ-সাত বছর এভাবেই তাকে জিন, পরী ও নানা রকমের বায়-বাতাস থেকে রক্ষা কর হ'ল।

রাঙ্গাখালা আর মন্নাই হ'ল আসাদের অন্তঃপুরের গার্জিয়ান। নানী অসুস্থ তাই রাঙ্গাখালাই সর্বেসর্বা। তার দেওয়া পট্‌কা নামটাই বহাল হয়ে গেল টিংটিং-এ আসাদের জন্য। হাত পা কেটে রক্ত পড়লে রাঙ্গাখালাই গ্যাঁদাফুলের পাতা বেটে লাগিয়ে দিত, আর সারারাত কপালে জলপট্টি দিয়ে বিনিদ্র রাত পার করে দিত। কৈশোরের শেষের দিকে রাঙ্গাখালা হয়ে উঠেছিলেন অসম্ভব সুন্দরী। রাস্তায় বেরোলেই পরিষ্কার বোঝা যেত। রাঙ্গাখালার পড়াশোনার ব্যাপারে কোন গাফিলতি করেননি আসাদের নানা। কলেজে গার্লস্ গাইড্ লীডার হিসাবে একবার পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী বেগম রানা লিয়াকত আলির সাথে তার দেখা করবার সুযোগ মেলে। পিকচার প্যালেস সিনেমা হলে হয় এ সমাবেশ। এই কিছুদিন হ'ল নীলা হলের মালিক ইন্ডিয়া চলে যাবার পর, হলের নতুন মালিক এই নাম দিয়েছে- পিকচার প্যালেস। রাঙ্গাখালা আসাদকে সাথে নিয়ে

গিয়েছিল এই সাক্ষাতকারে। শোনা যায়, বেগম লিয়াকত আলির বংশে নাকি রাজপুত রক্তের মিশ্রণ আছে। সেই অদ্ভুত সুন্দরী মহিলার পাশে রাঙ্গাখালাকে দেখে আসাদের মনে হ'ল তারা একই রকম দেখতে।

হঠাৎ ঝড়ের মতো একদিন রাঙ্গাখালার বিয়ে হয়ে গেল। সুন্দরী হলেও বাপ-মা হারা মেয়ের বিয়ে অত সহজ নয়। রাঙ্গাখালার বরের বয়স একটু বেশী। মাথার সামনের দিকে চুল কম। বিয়ের পর একদিন খুলনা পার্কের পুকুরের সামনে রাঙ্গাখালার বর গেদুমামা, রাঙ্গাখালা আর আসাদের একটা ফটো তুললেন। সেই প্রথম কেউ শখ করে আসাদের ফটো তুলেছিল। অভিভূত হয়ে তার নামকরণ করা হ'ল ক্যামেরা আংকল। বিয়ের পর প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রবল বৃষ্টির ভিতর হাডুডু খেলতে নেমে গেল রাঙ্গাখালা। ভাগ্যিস ক্যামেরা আংকলের মা-বাবা ছিল না, বোনের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন হয়েছিল। সবাইকে তাক লাগিয়ে নতুন বৌ হৈ হৈ করে হাডুডু খেলে গেল। তার পরেই ক্যামেরা আংকলের সাথে খালাকে চলে যেতে হ'ল মাদারিপুর, সেখানে কি জানি ব্যবসা তার। এর সাথে সাথে আসাদেরও নানার বাড়িতে থাকবার পাট চুকল।

ভাগ্যের কী পরিহাস! কয় বছর পর আসাদ আবার রাঙ্গাখালার সাথে মাদারিপুরে এক বছর কাটানোর সুযোগ পায়। বাবার বদলীর চাকরির দৌলতে বারবার স্কুল বদলানোটা ছিল এক স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু এক বছরে তিনবার? সেটা একটু বেশী। তাই সেভেন বা এইটের মাঝামাঝি একরকম জোর করে রাঙ্গাখালা পট্‌কা আসাদকে নিয়ে এলেন মাদারিপুরে। এর মধ্যে পট্‌কা ফুলে গোবর্দ্ধন- তাতে কোন সমস্যা নেই- পট্‌কা নামটাই বহাল রইল। বিয়ের এত বছর পরেও রাঙ্গাখালা সন্তানহীনা, ক্যামেরা আংকল ব্যবসার কাজে নানাসময় থাকতেন কোথায় কোন গ্রামে- পালং, রাজৈর, মকসদপুর বা কাশিয়ানি। যেখানে পাট, তিসি বা ছোলার মরশুম।

মাদারিপুর। আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গনের মুখে এই মহাকুমা শহর। রাঙ্গাখালার বাড়িটা ছিল একটা দোতলা কাঠের বাড়ি। উপর তলায় চার ধারে ঘোরানো বারান্দা। পিছনে ধানের ক্ষেত। বন্যার পানি চলে যাবার পর সে ক্ষেত শুকনো। তারপর বাদামতলি সিনেমা হল। সেটা বছরের ছ-মাস অচল। সচল থাকলে সন্ধ্যের ফার্স্ট শোর আগে মাইকে গান বাজানো হ'ত- ভিগা ভিগা হ্যায় সামা---। হ্যারিকেনের আলোয় কতক্ষণ আর জ্যামিতির উপপাদ্য পড়া যায়? একটু পরেই আসাদ সেই অপরূপ গানের সুর লহরীতে তাল দিয়ে গাইতে থাকে- মেরা দিল ইয়ে পুকারে আজা, মেরে গম কে সাহারে আজা, ভিগা ভিগা হ্যায় সামা---। একটু পরে রাঙ্গাখালা টের পেয়ে কানটা মলে দিয়ে ১৬ উপপাদ্যটা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন- ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। আসাদ তাকে মাঝেমাঝে পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন করত- এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটে প্রদেশ মিলে এক ইউনিট হ'ল, একটা প্রদেশে, এর মানে কি দাঁড়াল? কিংবা এখনও তো সরোয়ার্দি সাহেব প্রধানমন্ত্রী আর মুজিবর রহমান বাণিজ্য-মন্ত্রী- এতে আমাদের লাভ না? রাঙ্গাখালার নির্বিকার উত্তর- কি আর লাভ? কেন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নৌকা-মার্কা বাক্সে তো বিরাটভাবে জিতল কিন্তু তাতে লাভটা কি হ'ল বুঝি না, দু তিন বছরও তো পার হয়ে গেল কোনও উন্নতি তো দেখি না।

কাঠের দোতলার সামনে ছিল আর একটা টিনের ঘর। ওটা ক্যামেরা আংকলের অফিস ঘর। আর তার সামনে পুকুর। পুকুরটার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে বড় রাস্তায় পড়বে। ঐ রাস্তার কোণাতেই নাগ ফার্মেসি। অমল নাগ আর আসাদ ছিল দুই কুঁড়ের বাদশা- খেলাধূলায় কোন উৎসাহ নেই, দুজনে পড়ত ডিটেক্‌টিভ্ বই আর বিকালে ক্যামেরা আংকলের অফিস ঘরের সামনের বেঞ্চিটাতে বসে একজন আরেক জনের ডিটেক্‌টিভ্ পারদর্শিতার পরীক্ষা নিত সদ্য পড়া নভেল থেকে। অমল এক ক্লাস উপরে পড়ে, হিন্দী ছবির উপরে ওর অগাধ দখল। ও জানাল- ওই যে ভিগা ভিগা গানটা- সেই গায়িকার নাম- লতা। শেষের নামটা মুঙ্গেশ বা ওইরকম কিছু। মাদারিপুরে আসার পর থেকে নিঃসন্তান রাঙ্গাখালার নিঃসঙ্গতা কিছুটা কেটেছে মনে হয়। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হলেই রাঙ্গাখালা ঝালমুড়ি আর চা নিয়ে বসতো। শীতের আমেজ আসতেই রাঙ্গাখালার ফরমাশ- এই পট্‌কা, যা না, কয়টা গরম ডালপুরি নিয়ে আয় না। মিলন সিনেমা হলের সামনে বসে যে ডালপুরিওয়ালা- ধনেপাতা আর খুব ঝাল দেয়- সেটাই তার বিশেষ পছন্দ। আর পছন্দ সুপারী। পান, দোক্তা, চুন নয়- শুধু সুপারী- মাঝে মাঝে এক আধটা লবঙ্গ। অমলের মা তাই তার নাম দিলেন- লবঙ্গলতিকা। হাসিখুশী প্রাণবন্ত একটি জীবন রাঙ্গাখালার। পৃথিবীর কোন বেদনা, দুঃখই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কোন আনন্দ কোন দুঃখই বোধহয় চিরস্থায়ী হয় না। রাঙ্গাখালা ভুলে গেছে সে বাবা-মা হারা মেয়ে- পরের ঘরে মানুষ। হাসিখুশীর পিছনে যে তার আরো একটা বিরাট দুঃখ ছিল তা বোঝা যেত না কোন সময়ে। আসাদের স্কুলটা মিশনারী স্কুল। রোববার বন্ধ, আর শুক্রবারে মর্নিং স্কুল। রাঙ্গাখালার সব ব্যবস্থা পোক্ত। আগের রাতেই কেনা থাকে পাঁউরুটি, কলা আর অন্য কিছু ফল। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে আসবে বসন্ত। তার কাঁধে ঝোলানো ঘোল, দৈ-এর হাঁড়ি, আর কলাপাতায় মোড়া সদ্য টানা গরুর দুধের মাখন- নির্ভেজাল। পাঁউরুটিতে মাখন আর একটু চিনি মাখা আর কলা- এই হচ্ছে শুক্রবারের মর্নিং স্কুলের বাঁধা নাস্তা।

এমনই এক শুক্রবার। মর্নিং স্কুলের পরে দুপুরে বাড়ি এসে আসাদ এক অপরিচিত লোককে দেখতে পায়। ক্যামেরা আংকল বাড়িতে নেই, রাজৈর নয় বাজিতপুরে। কাজের মেয়ে সূর্যটাও নেই বাড়িতে। বাবরি চুল, লাল লুঙ্গী আর লাল ফতুয়া পরা লম্বা লোকটা ধূপ-ধুনো আর আগরবাতি জ্বালিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কি সব হাম্বা বাম্বা আউড়ে যাচ্ছে। রাঙ্গাখালা তার সামনে করজোড়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। অন্যদিন এ সময় তড়িঘড়ি করে খাবারের বন্দোবস্ত করত- ভাত বা রুটি আর ভাজি। আজ আসাদকে ইঙ্গিতে চুপ করে বসতে বলল রাঙ্গাখালা। লোকটার লালপানা চোখ, চুল দাড়ি এলোমেলো, অপরিষ্কার। কেমন যেন নাগ ফার্মেসির পাশের আফিং-ভাঙ্গের দোকানের পাশে ঘুরঘুর করা লোকেদের মত। একদম অপছন্দ লোকটাকে আসাদের। কী করছে সে? রাঙ্গাখালা লোকটাকে বড় থালায় অনেক খাবার এনে দিল- ভাত, কুমড়ো ভাজা, সর্ষে-

ইলিশ আর মুগের ডাল। এত সব রাঙ্গাখালা রাঁধলই বা কখন? খাবার পর একটা ছোট চিরকুট রাঙ্গাখালার হাতে গুঁজে দিল লোকটা। তারপর আসাদের দিকে তাকিয়ে বলল- দেখি তোর হাতটা, হাত দেখা- ভবিষ্যত বলব। হাতটা টেনে দু মুহূর্তে দেখে জোর গলায় হেসে উঠল লোকটা- তোর এ ছেলের তো মহা ভাগ্য রে রাঙ্গা, এর হাতে তো পুকুর আছে- পুকুরওয়ালা বাড়ি, আর তোরও এমনি ছেলে হবে দেখে নিস। লোকটা পান চিবুতে চিবুতে কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে চলে গেল।

- কে এই লোকটা খালা?
- আমার গুরুদেব।
- গুরুদেব? সেটা আবার কে?
- সবই তোকে বলতে হবে নাকি? রাঙ্গাখালার গলায় এক অস্থির অসহিষ্ণুতা।
- পট্‌কারে, তুই আমার একটা কাজ করে দিবি?
- কী কাজ রাঙ্গাখালা?
- আজ বিকেলে বাজার থেকে আমাকে কয়টা পান-সুপারী কিনে দিবি?

আসাদ আশ্চর্য গলায় জিজ্ঞাসা করে- পান সুপারী? সেটা কি আবার কাজ হ'ল?

- না না, রাঙ্গাখালা বাধা দেয়, এটা যেমন তেমন পান-সুপারী না, পানগুলো খুব খেয়াল করে কিনবি, সেগুলো হতে হবে গায়ে গায়ে লাগানো। দুটো সুপারী কিনবি, সে দুটো যেন মুখোমুখি লেগে থাকে। দাম যা হয় হবে, পারবি না?
- নিশ্চয়ই, মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানায় আসাদ। বিকেলেই জাদুর পান-সুপারীর বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

শনিবার ক্যামেরা আংকল বাড়ি ফেরার পর থেকেই কেমন জানি পরিবেশটা নিঝুম আর অস্বস্তিকর হয়ে উঠল এক নিমেষে। দুদিন আগে ক্যামেরা আংকল নাগ ফার্মেসির ঐ পাশের বাড়ির সোমত্ত মেয়ে পদ্মাকে নিয়ে বৈজু বাওরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। রাঙ্গাখালা এই নিয়ে বড় ধরনের ঝগড়াও করেছে। আজ রাঙ্গাখালা খুব সুন্দর আর পরিপাটি করে কাপড় পরেছে, একটু পরে দুটো পান বানিয়ে ক্যামেরা আংকলের হাতে দিয়ে আসল। তারও একটু আগে আসাদ জানালা দিয়ে দেখেছে রাঙ্গাখালা কীসব বিড়বিড় করে বলে পানে ফুঁ দিয়েছে তিন বার। গুরুদেবের দেওয়া মন্ত্রটা মুখস্থ করে ফেলেছে রাঙ্গাখালা। বোঝা গেল বশীকরণ মন্ত্র ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি। ধন্বন্তরি এ ওষুধ! গার্লস গাইডের ডাকসাইটে লীডার তন্ত্র মন্ত্র করছে! যতটুকু জানে আসাদ এতে ক্যামেরা আংকলের কোন পরিবর্তন হয়নি আর রাঙ্গাখালাও কোনদিন মা হয়নি।

অ্যানুয়াল্ পরীক্ষার পরেই আসাদকে ফিরে যেতে হয়েছে বাবা-মার কাছে আরেক নতুন স্কুলে। অমল এসে জানাল সেও চলে যাচ্ছে ওর এক জ্যাঠামশাই-এর কাছে- পশ্চিম দিনাজপুরে। ওখান থেকেই স্কুল ফাইনালটা দেবে বছর দুয়েক পরে। পরিবর্তনের অমোঘ চাকা ঘুরতেই থাকে। আসাদ আর অমলের হয়ত কোনদিনই আর দেখা হবে না, আর কোনদিন তারা ডিটেক্‌টিভ্ রহস্যের সমাধান করতে পারবে না। পশ্চিম দিনাজপুরটা যেন কোথায়?

এত বছর বাদে রাঙ্গাখালা একটা চিঠি দিয়েছে। মাদারিপুর শুধু একটা আবছা স্মৃতি মাত্র। মেডিকেলের দু বছর শেষ, পড়াশোনার প্রচন্ড চাপ। ঢাকা থেকে ক'দিনের জন্য খুলনায় এসেছে আসাদ নানার মৃত্যুবার্ষিকীতে। রকেট করে যেতে হয় খুলনা থেকে ঢাকায়- এটা একটা স্টীমার- ২০-২২ ঘন্টা লাগে, সপ্তাহে শুধু দুদিন যায়। একটা স্টীমারের নাম অস্ট্রিচ, অন্যটার নাম কিউই- কোন অজানা কারণে অস্ট্রেলিয়ার দুটি পাখীর নামে এদের নামকরণ! এখন সেসব প্ল্যান বাদ দিয়ে একদিনের জন্য হলেও মাদারিপুর যেতে হবে। রাঙ্গাখালার ছোট্ট চিঠি- পট্‌কা, একবারটা আসবি? বড় ইচ্ছা হয় দেখতে তোকে। যেখানে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই, নেই কোন দায়িত্বের অধিকার- সেখানে জোর খাটে না। শুধু ভালবাসার দাবিটা খুব দুর্বল। মন্না প্রশ্ন করল- রাঙ্গা কি পোয়াতি হইছে?

- জানি না।

রাতভর লঞ্চে এসে, তারপর মাইল দুয়েক পায়ে হেঁটে আসতে হ'ল আসাদকে। রাঙ্গাখালার মাথার চুলে সাদার অংশ বেড়েছে বেশ, চোখে একটা চশমা, চোখের সেই ঝিলিক বা দীপ্তিটা দেখা গেল না। 'পাখিটি মরিয়াছে'।

- পট্‌কা তুই ডালপুরি খাবি? আসাদকে দেখে রাঙ্গাখালা প্রশ্ন করে।

এখনও সেই কাঠের দোতলা। নাগ ফার্মেসি বন্ধ হয়ে গেছে, ক্যামেরা আংকলের অফিসটা বন্ধ, পুকুরটাতে শ্যাওলা ভর্তি, বাদামতলির সিনেমা আর চলে না, পিছনের ধানক্ষেতটা আর নেই- এখন সেখানে একটা বস্তি। আয়ুব খানের আমলে ষাটের দশক, মুজিবর রহমান জেলে। রাঙ্গাখালা আস্তে করে আসাদের গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞেস করে- তুই ভাল আছিস তো? দেখি দেখি- কপালের সেই কাটা দাগটা তো তেমনই আছে। মনে আছে, নাথুরাম তোকে ধাক্কা দিয়ে চৌবাচ্চায় ফেলে দিয়েছিল- কী রক্ত কী রক্ত! গাঁদা ফুলের পাতা বেটে তোর কপালের রক্ত বন্ধ করলাম আমি। আচ্ছা তুই ঐ গানটা গাস এখনো- ভিগা ভিগা হ্যায় সামা? না না, তুই অন্য গানটা কর- 'গ্রাম-ছাড়া ওই রাঙ্গা মাটির পথ'। রাঙ্গার জন্য রাঙ্গা মাটি। নিজের রসিকতায় হাসছে রাঙ্গাখালা- অনর্গল, অসংলগ্ন কথা বলে চলল রাঙ্গাখালা। একটু অস্বস্তি নিয়ে আসাদ প্রশ্ন করে- ক্যামেরা আংকল কোথায়?

আস্তে আস্তে রাঙ্গাখালা অনেক মনে করার চেষ্টা করে বলল- জানি না, আমাকে তো বলে যায়নি।

- তোমার কি মাথা ব্যথা? তোমাকে না বারণ করেছি শুধু শুধু সুপারী খাবে না- ওতে ফাংগাস্ থাকে।
- ও তাই? রাঙ্গাখালার জড়ান জবাব।
- কেমন যেন সব ভুলে যাই, জানিস পট্‌কা। ঐ যে আমার গুরুদেবটা- ওটা কোন কাজের নয়। আমার হার চুড়ি বিক্রি করে তাকে কত পয়সা দিলাম, কিন্তু আমার ছেলেও হ'ল না, তোর আংকলও ঘরে থাকল না।

রাঙ্গাখালার চোখদুটো যেন কোথায় গিয়ে ঠেকে আছে, বোঝা গেল না। ডাক্তারি বিদ্যা ভিতর থেকে বলল- অল্‌জাইমার! একদিন বাদেই ঢাকা চলে যেতে হয় আসাদকে। সেটাই ছিল রাঙ্গাখালার সঙ্গে তার শেষ দেখা।

ক্যানাডায় সার্জারীর ইন্টার্ন আসাদ। একই বছরে তার দুটো প্রিয় মানুষ মারা গেল- মন্না আর রাঙ্গাখালা। একজন অশীতিপর বৃদ্ধা আর একজন তার বয়সের অর্ধেক। পট্‌কা নামে ডাকবার আর কেউ রইল না। মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায়- রাঙ্গাখালার স্ট্রোক্ হয়েছিল সাথে অলজাইমার। সত্যি কি তাই? নাকি এই পরিচয়হীনা, স্বামীহীনা, সন্তানহীনা মানুষটি হাসির আড়ালে ভুলতে চেয়েছে সবকিছু স্বেচ্ছায়- না হতে পেরেছে মা, না হতে পেরেছে গৃহিণী। মনের অগোচরে সেই ভুলে থাকাটাই তার আত্মরক্ষার হাতিয়ার হয়েছিল। পৃথিবীতে এই সব মন্না আর রাঙ্গাখালারা আসে শুধু ভালবাসা দিতে, তারপর একদিন নাম না জানা ফুলের মত হারিয়ে যায়। হাতের তালুতে দু ফোঁটা নোনা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আসাদের- এইটুকুই শুধু তোমাকে দিতে পারলাম রাঙ্গাখালা, আর কিছুই নয়।

·•●❖●•·

আলো

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের সেই পুণ্য মুহূর্তে
যখন এসেছিলে এই ধরণীতে,
আলোর প্রথম পরশে
বুঝতে পারনি তার জ্যোতিকে,
তাই অজান্তেই চোখ বুজেছিলে।
কিন্তু ধীরে ধীরে এই আলোর
জগৎকে জেনেছিলে, চিনেছিলে,
ভেবেছিলে এইভাবেই আলোর পরশে
কেটে যাবে সারা জীবন।
কিন্তু যেদিন জানলে আলোর
উল্টোপিঠে আছে ঘোর অন্ধকার,
আছে আশার পেছনে হতাশা,
সেদিন আবার ভয়ে চোখ বুজেছিলে।
তবুও জেনে রেখো যেদিন
সত্যিই বরাবরের মতো চোখ বুজবে
সেই দিনও তোমাকে যেতে হবে
আলোরই পথ বেয়ে সেই আলোর উৎসে
যার আর এক নাম ঈশ্বর।

·•●❖●•·

হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ

দীপক বাগচী

হ্রস্ব উ, দীর্ঘ ঊ করে ফেলে বাড়াবাড়ি,
সেদিন তো হয়ে গেল একহাত মারামারি।
দীর্ঘ ঊ বলেছিল হ্রস্ব উ-কে ডেকে,
‘তুই ছোট, মুই বড়- নম দিবি দূর থেকে।’
হ্রস্ব উ দিয়েছিল সোজা তার উত্তর,
‘কিসে তুই বড় হলি? বড় শুধু মুখ তোর।’
দীর্ঘ ঊ বলে, ‘তোর মোর মতো আছে ল্যাজ?’
হ্রস্ব উ বলে, ‘বেশী করিস না ভ্যাজ্‌ভ্যাজ্।’
কথা কাটাকাটি থেকে দুজনেই যায় রেগে,
রাগ থেকে হাতাহাতি, লাঠালাঠি যায় লেগে।
তাই দেখে ছুটে আসে বর্ণমালারা সব,
কোনমতে রোখে দুয়ে তুলে তারা কলরব।
তারা বলে, মারামারি করে কিবা হবে ফল?
বিচার করেন যিনি, তাঁর কাছে যাই চল।
বিচারের এজলাসে একসাথে সবে যায়,
তাদের বিবাদ-কথা সবিশদ বলে তাঁয়।
সব শুনে ক’ন তিনি, ‘ঝগড়া কেন বা কর?
তোমাদের দুজনের কেউ নয় ছোট বড়।
সম্মানে, চাহিদায় নও কেউ অসমান,
প্রমাণটি দেব তার জুতসই একখান।’
তিনি ক’ন, ‘দেখোনি কি বানানেতে বাংলায়,
‘পুজো’, ‘পূজা’ মানে এক, তবু দুইই লেখা যায়।
চলতি বাংলা হলে প’য়ে দেয় হ্রস্ব উ,
সাধুভাষা লেখে যবে, দিতে হয় দীর্ঘ ঊ।
হ্রস্ব উ চলে সাথে পুজো দিতে কালী-মায়,
দেবতার পূজা দিতে দীর্ঘ ঊ সাথে যায়।’
শুনে তাঁর যুক্তিটা বিবাদীরা খুশী হয়,
তখনি বিবাদ ভুলে তাঁর পদধূলি লয়।
সেই থেকে দুজনের বিবাদের নাই জের,
বর্ণমালার দেশে ফিরেছে শান্তি ফের।

·•●❖●•·

আমি জননী, আমি তনয়া- আমি শকুন্তলা...

সুমিতা বসু

এক গন্ডুষ পবিত্র নদীর জল আঁজলা ভ'রে পান করে আমি ধীরে ধীরে ঘাটে উঠে এলাম। আজ এ দুনিয়ায় আমার কেউ নেই। এই বিশাল নগরীতে কেউ আমার পরিচিত নয়। সারারাত এই বৃক্ষতলে একা একা বসে আমি ভীত, সন্ত্রস্ত, বাকরুদ্ধ। গতকাল অপরাহ্নে, রাজদরবারে সর্বসমক্ষে আমাকে মিথ্যাচারিণী, কুলভ্রষ্টা, ছলনাময়ী, সুযোগ-সন্ধানী ইত্যাদি সম্বোধনে ভূষিতা করা হয়েছে- আর করেছেন স্বয়ং দেশের রাজা- আমার বিবাহিত স্বামী! ছিঃ ছিঃ- কী লজ্জা, এখনও কানে ধ্বনিত হচ্ছে সেই বাক্য- সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর পরিষদদের ব্যঙ্গ হাসি। ছিঃ ছিঃ- এখনও আমি জীবিত, কেন, কেন আমার মৃত্যু হ'ল না? কেন সর্বসমক্ষে অবনতা, ভীতা হয়ে শুধু দাঁড়িয়েই রইলাম নীরবে? কেন বলতে পারলাম না- 'রাজা দুষ্মন্ত, আমি সরলা আশ্রমবালিকা- তোমার ছলনার ও কৌতুকের যোগ্য নই!'

কালও প্রাসাদ প্রবেশের পূর্বে এই নদীতীরেই আমরা পদ প্রক্ষালন করেছিলাম- সঙ্গে ছিলেন আশ্রম ভাইয়েরা। কত উদ্দীপনা, আকাঙ্ক্ষা, সলজ্জ অভিমান নিয়ে নদীমাতাকে প্রণাম করে বলেছিলাম- 'আমার স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারি যেন- তুমি আশীর্বাদ করো!' মনে পড়ে গেল সেই আঁজলা ভরে জল নেওয়ার সময়ই আমার হাত থেকে অঙ্গুরীয়টি কোথায় যেন তলিয়ে গেল নদীগর্ভে। অনেক সন্ধান করেও পাওয়া গেল না! সহসা মনে পড়ে যাচ্ছে- দুর্বাসা মুনির অমোঘ তিরস্কার- 'যার জন্য তুমি শকুন্তলে, চিন্তামগ্ন থেকে আমাকে যথাযথ অর্ঘ্য দিলে না- সেই তিনিই তোমাকে চিনতে পারবেন না।' আমি কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, 'না না না- মহর্ষি, ক্ষমা করুন, আমি অপরাধিনী, আপন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে আপনাকে সেবা করতে বিলম্ব করে ফেলেছি।' সহসা মনে পড়ে গেল- তিনি বলেছিলেন, 'বেশ কোনও চিহ্ন দেখাতে পারলে---' চিহ্ন? ঐ অঙ্গুরীয়ই তো আমার একমাত্র চিহ্ন! তবে কি তিনি সেই জন্যই আমাকে বিস্মৃত হলেন? কোথায় - কোথায় সেই অঙ্গুরীয়? আমি আবার নদীতে গিয়ে তন্ন তন্ন করে অঙ্গুরীয়র সন্ধান করতে লাগলাম। কত প্রহর কেটে গেল, কে জানে! কোথায়, কোথায় আমার অঙ্গুরীয়- আমার একমাত্র অভিজ্ঞান? হায়- নদীমাতা- দাও ফিরিয়ে দাও আমার একমাত্র চিহ্ন!

বেলা বুঝি তিন প্রহর- মধ্যগগন থেকে সূর্যদেব গেছেন পশ্চিমপানে ঢলে- ক্লান্ত, শ্রান্ত, প্রায় বিধ্বস্ত আমি ধীরে ধীরে উঠে এলাম পুনরায় সেই বৃক্ষতলে। ক্ষুধায়, রাত্রিজাগরণের শ্রান্তিতে, অপমানে, ভয়ে- বসে থাকার ক্ষমতাও আমার নেই। আহা, কী আনন্দে সেই অপরূপ মনোরম পরিবেশে কেটেছে আমার আশৈশব জীবন। আর আজ আমি একবস্ত্রা- অনাথিনী-কলঙ্কিনী-ভিখারিণী! আমি শকুন্তলা কিন্তু আর কোনও শকুন্ত পাখি নেই, যে তার দুই ডানা মেলে আশ্রয় দেবে আমায়। এক ঝাঁক পাখির দল গান গাইতে গাইতে উড়ে গেল কোন নাম-না-জানা দেশে। আকাশ পানে চেয়ে দেখলাম, সেও যেন পরম বিস্ময়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমার পরম দেবতার পানে দুহাত জোড় করে বললাম- 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে, কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে? যদি প্রেম দিলে না প্রাণে-' প্রেম? প্রেম বলে কিছু নেই আমার জীবনে- যার স্বামী প্রকাশ্যে তাকে কলঙ্কিনী বলে- মুদ্রা দিয়ে, রঙ্গ করে বলে চাতুরীর দক্ষিণা- ছিঃ ছিঃ- প্রেম কোথায় তার জীবনে?

গতকাল পর্যন্ত যা ছিল সত্য, যা ছিল অধিকার, আজ তা শুধু স্মৃতি! স্মৃতি-পথ দিয়ে ভেসে এল মনোরম তপোবন। সুপ্রভাত সেখানে এসেছে আশ্রমবাসীর শান্ত বেদ মন্ত্রের আরাধনায়, আর সূর্যাস্ততে বৈতালিক সঙ্গীতের সুরমূর্ছনা। পোষ্য হরিণ, বরাহ, ময়ূর এমনকি গাভীগুলিও এক গহন শান্তিতে অবগাহন করে, আশ্রমের তরুলতা, বৃক্ষাদির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সহাস্যে জীবনযাপন করছে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে। সেই আশ্রমবালিকা আমাকে নিয়ে সপারিষদ দেশের রাজা ধিক্কার দিয়ে প্রকাশ্য রাজসভায় বললেন- 'ছলনাময়ী, চাতুরীদক্ষা রমণী- আহা: বিদুষক কিছু পারিতোষক নিয়ে বিদায় করো।' বিদুষক উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে বলল- 'রাণীর আসন যাচ্ঞা করতে এসেছ- নাও এক স্বর্ণমুদ্রা নাও- কোনো বৃক্ষতলে আপন প্রাসাদ বানাও।' সকলে হো হো হা হা করে হেসে উঠল। ইস্, কেন সেই বিদ্রূপ শ্রবণেও আমার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'ল না। কেন, কেন?

জঠরে কীসের যেন অনুভূতি? ওঃ, বিস্মৃত হয়েছিলাম এতক্ষণ- আমার গর্ভে তাঁর সন্তান- আমি মা হতে চলেছি। কী মধুর এই শব্দ- 'মা', যে ওম্ ধ্বনি শিক্ষা করে সারাজীবন উচ্চারণ করেছি, এই 'মা' শব্দটি ওম্ ধ্বনির মতোই গভীর, পবিত্র, যেন বীণার আনন্দময় মূর্ছনা! কত বিনিদ্র রজনী এই মা ডাক ডেকে ডেকে একা একা নিঃসঙ্গ শয্যায় শৈশবে ঘুমিয়ে পড়েছি। মায়ের একটু উষ্ণতা পাওয়ার জন্য কখনো কখনো মধ্যরাতে মাতা গৌতমীর শয্যাপাশে তাঁর অঞ্চল বুকে জড়িয়ে শুয়ে থেকেছি! শুনেছি, পিতার তপস্যা ভঙ্গ করতে, লালসা জাগাতে মা-মেনকা এসেছিলেন মর্ত্যে। তবে কি আমার জন্মলগ্নেই বিধাতা লালসার টীকা এঁকে দিয়েছিলেন আমার কপালে? মা-মেনকা মাতৃত্বকে করেছিলেন অস্বীকার- কেউ কী তা পারে? পিতা কণ্ব বলেছিলেন- তিনিই একাধারে আমার মাতা ও পিতা! সযত্নে আমাকে মায়া-মমতা ও ভালবাসায় ভরে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই মন্ত্র মাথায় নিয়েই আমি বাঁচব- বাঁচব আমার সন্তানের জন্য- তাকে ভরিয়ে দেব ভালবাসায়, মমতায়- গড়ে তুলব তাকে অপরিসীম স্নেহে। প্রথম সূর্যাভার মতো আমার এই সংকল্প- সমস্ত দেহে ছড়িয়ে দিল আনন্দ।

মধ্যদিনে এই অঞ্চলে অনেক লোক। এত লোক সমাগম দেখা এই প্রথম আমার জীবনে। সকলেই যেন ব্যস্ত, অস্থির- কেউ কেউ কৌতূহলভরে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। করুক, আমি সহ্য করে নেব। এখন আর উপায়ই বা কী? এ পৃথিবীর আমি কিছুই জানি না, চিনি না। শুধু যে আশ্রমকে চিনতাম- সে পথ আমার রুদ্ধ। আমি স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছি আমার আশ্রমবাসী বন্ধু-আত্মীয়দের থেকে। তাদের অনুনয়, অনুরোধ- কান্না কিছুই আমাকে আমার স্থির সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এখন, জীবনের

অবশিষ্ট দিনগুলি একাই পথ চলতে হবে, আর পাশে থাকবে আমার সন্তান- পুত্র অথবা কন্যা, তবু আমারই অন্তরের পুত্তলি। মাতৃজঠরে মাতৃস্নেহে লিঙ্গ ভেদাভেদ নেই কিছুই- এ শুধু মানবসমাজের কিম্বা পুরুষ সমাজের বিধান! হায় বিধাতা--- পরম যতনে আমি গড়ে তুলব মানুষ- পুত্র বা কন্যা যাই হোক না কেন।

ধীরে ধীরে পুনরায় বৃক্ষতলে এসে বসলাম। পশ্চিমাকাশে রঙের খেলা- সূর্যাস্ত হতে আর বুঝি বিলম্ব নেই- সেই অস্তাচল সূর্যের আলোকটীকা এসে পড়ল আমার কপালে। প্রণাম করে বললাম- হে সূর্যদেব, তোমায় সাক্ষী রেখে বলছি, আমি দ্বিচারিণী নই- ছলনাময়ী নই। এই সকল সংজ্ঞা আমার বোধগম্য নয়। গান্ধর্বমতে বিবাহের পরেই স্বামী সহবাসে আমি সন্তান-সম্ভবা হয়েছি। যদি আমার পুত্র সন্তান হয়, আমি তার নাম দেব ভরত আর কন্যা হলে নাম দেব ভারতী। আমার পুত্র বা কন্যা হবে আদর্শ মানবসন্তান। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। তুমি আমাকে ত্যাগ করো না। আমার পিতা নেই, মাতা নেই, স্বামী নেই- এই না পাওয়ার বেদনা যেন সহস্র ধারায় আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ে আমার সন্তানের ও তার বংশের ওপর। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো সূর্যদেব! তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

কঠিন নির্মম বাস্তবকে অতিক্রম করে আমার দ্রুতগামী মন অকস্মাৎ স্মরণ করিয়ে দিল সেই দিনটিকে- মদনদেবের ছলনায় যেদিন প্রহর শেষের রাঙা আলোয় আমি দেখেছিলাম আপনার সর্বনাশ। সেদিন কিন্তু মনে হয়েছিল সর্বনাশ নয়, সে যেন ফুল্লমাস- বসন্ত সমাগম আমার জীবনে!

তপস্যার সুকঠোর নিয়ম সংযমের কঠিন বেষ্টন মধ্যে প্রকৃতির এ কী আত্মস্বরূপ বিস্তার! আমি নিষ্পলক চোখে কৌতুক বোধ করছিলাম এই সহসা সলজ্জ পরিবর্তনে। ঋষিবালক পরিহাস করে আমায় বললে, 'ভগিনী, তোমার মনের পুষ্পও কি বিকশিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল? এই নৈবেদ্য কার তরে?' আমি বলেছিলাম, 'ফুল ফোটাই তো ফুলের পরম কথা, কার নৈবেদ্য হ'ল বা হ'ল না, কী বা তাতে গেল এল? ফুলের জিত তার আপনার আবির্ভাবে।' আশ্রমবালক কৌতুকভরে প্রত্যুত্তরে বলেছিল, 'অকাল বসন্তের আগুন তোমার অক্ষিপল্লবে, এ যেন এক নতুন শকুন্তলা!' নতুন শকুন্তলা! কথাটা অব্যর্থভাবে বিদ্ধ হ'ল আমার চিত্তে- সে চিত্তদোলায় আনন্দ ছিল, সঙ্গে উৎকণ্ঠাও। ভারি অস্বস্তিতে পড়েছিলাম- অশোক কণিকার পুষ্পভূষণে সেজেছি- আমার সুদীর্ঘ বেণীতে জড়ানো লাল পলাশের মালা, বক্ষ'পরে দুলছে সুবাসিত পুষ্পমাল্য- অনসূয়া, প্রিয়ংবদার স্বহস্তে গ্রথিত। আমি সেই পুষ্পমাল্য দিয়েই আমার সংকোচকে ঢাকতে চাইলাম। তবু কখন ধরা পড়ে গেছি! ঠিক এই সময় তাঁকে দেখি- একেই কি বলে শুভদৃষ্টি! মাতা গৌতমী আমাকে হতচকিত বাক্‌হারা দেখে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'পিতা কণ্ব এখন অনুপস্থিত- তোমাকেই দিলাম রাজ অতিথি সম্ভাষণের ভার, তুমি যথাযথ পালন করো।' পার্শ্ববর্তিনী অনসূয়া বলেছিল, 'ভগিনী, ইনি দেশের রাজা দুষ্মন্ত- তুমিই পারবে অতিথি সৎকার করতে, দেখো যেন কোনও ত্রুটি না হয়।'
ত্রুটি? আমি তো সবই দিয়ে দিলাম- মন, প্রাণ, দেহ- সবই। তিনি বললেন, 'আমি এসেছি তোমার দ্বারে-। কিন্তু এখন মনে পড়ছে, তাঁর সঙ্গীদল উল্লাসে গেয়েছিল- 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা, বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জ্বালা'- মনের ভিতর দিয়ে এতদিন পর কথাগুলি যেন বুকে বাজল আজ। বসন্তে ফুল গাঁথায় কেন জ্বলবে আগুন? কিসের আগুন? সেই আগুনের লালসারই কী শিকার আমিও? সেদিন তো কই কিছুই বুঝতে পারিনি! গান্ধর্ব বিবাহ হ'ল মালাবদল করে। বাসর রাতে সেদিন ছিল ভরা পূর্ণিমা- আকাশ ঘন নীল- তারার আলোয় খচিত এক অপরূপ শোভা। প্রিয়তমর হাত আপনার বক্ষে ধরে বলেছিলাম- ঊর্ধে অগণ্য নক্ষত্রখচিত অসীম নীহারিকার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো- নৈর্ঋত কোণে ঐ সর্বোজ্জ্বল তারকাটির নাম ধ্রুবতারা। ঐ নক্ষত্রের আলো লক্ষ্য করেই আমরা আজীবন সত্যের পথে এগিয়ে যাব। দিগভ্রম হলে তুমি ও আমি সর্বদা গভীর তমসায়ও ঐ ধ্রুবতারার প্রদর্শিত আলোয় সত্যের পথ ঠিক খুঁজে নিতে পারব।

তিনি ঈশান কোণে সপ্তর্ষিকে দেখিয়ে বলেছিলেন- মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্যা, ক্রতু ও বশিষ্ঠ নিয়ে ঐ সপ্তর্ষি মন্ডল। আর ঠিক তার নীচে যে ছোট অথচ উজ্জ্বল তারাটি- ঐটি বশিষ্ট- পত্নী অরুন্ধতী, যিনি পঞ্চসতীর অন্যতমা। তোমার প্রেমে ও পবিত্রতায় তিনিও পাবেন লজ্জা- তুমি বিশ্বের রমণী কুলশ্রেষ্ঠা।

মধ্যদিনের সূর্য মধ্যগগনে। এই স্থানটি কোনো বেচা-কেনা হাটের কাছেই মনে হয়। সম্বিত ফিরে দেখলাম অনেকেই কৌতুকভরে কিম্বা ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইছে। বাস্তব বড়ই নির্মম- তবুও কর্ণগোচরে সেই শব্দ বারম্বার ধ্বনিত হতে লাগল- 'তুমি বিশ্বের রমণী কুলশ্রেষ্ঠা!' হায় রাজা আজ তোমারই প্রাসাদ থেকে বুঝি আধ ক্রোশ দূরে বসে আছে সেই রমণী কুলশ্রেষ্ঠা নাকি কুলভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী! যার স্বামী তাকে বলে ভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী- ছলনায় সম্পর্ক দাবী করতে চায়- সন্তান নাকি কার না কার- বলতে পারো রাজন্, তার স্থান কোথায়?
পিতা কণ্ব বলবেন- মানুষের সত্য সেই মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ!
আমি উঠে দাঁড়ালাম- দিনের আলোতেই পথ চলতে হবে আমাকে, ভিক্ষা করে নিতে হবে ক্ষুধার অন্ন আমার অজাত সন্তানের জন্য। ঘর বাঁধতে হবে তাকে আশ্রয় দেবার তরে- সবই করতে হবে একা কিম্বা আর সকলের সহায়তায়। অনেক দূরের পথ এখনও বাকি। পৃথিবীতে সবকিছু আছে, ছিল, থাকবেও- শুধু কঠিন, কঠোর, নির্দয় বাস্তব আমার মন থেকে অপহরণ করে নিল কোমল কুসুম আমার প্রেম- চিরদিনের তরে।

মধ্যগগনে জ্বলন্ত অগ্নিদেবকে বললাম- 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে, কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে?' বলো, তুমি বলো! পবিত্রতা কিনা জানি না, তবু আমি চিরজয়ী নারী। মহর্ষি পিতা কণ্বের পরমপ্রিয়া কন্যা আমি- সেই পিতৃস্নেহে কোনো খাদ নেই। তেমনি- স্নেহ নিম্নগামী- আমার সন্তানকে আমি ভ'রে দেব ভালবাসায়। এই ভালবাসার মন্ত্রে সে হয়ে উঠবে এক পরিপূর্ণ মানুষ। জননী হয়ে এই আমার পরম অঙ্গীকার।

আমার কলকাতা আমার হিউস্টন

অপর্ণা দত্ত

আজকে আবার প্রেমে পড়ে গেলাম! না না,- খুব বেশী excited হওয়ার কোনো কারণ নেই! প্রেমে পড়ে গেলাম হিউস্টনের। আমার চোখে 'দ্বিতীয় কলকাতা'! 'আবার' লিখেছি কারণ কলকাতা আমার 'প্রথম প্রেম'--- ছিল, আছে আর চিরকাল থাকবে। ওর জায়গা এ জীবনে কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু কোনদিন ভাবিনি কলকাতার পরেও অন্যকিছু মনকে এভাবে নাড়া দেবে!

সকালবেলা যাচ্ছিলাম Hillcroft-এর দিকে বড় ছেলেকে নিয়ে। সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখলাম রাগ অনেকটা কমে গেছে। আমার না--- আকাশের! ঠিক যেমন কোন এক দাপুটে গিন্নি বেশ অনেকক্ষণ প্রবল রাগারাগি করার পর আপাত-নিরীহ কর্তার আপাত-সত্যি explanation আর ক্ষণস্থায়ী মার্জনা ভিক্ষার পর বেশ একটু নরম হয়ে যান। আমার কেন জানি না এই উপমাটাই মনে এল হঠাৎ করে।

একটা জায়গায় রাস্তাটা একটু উঁচু হয়ে নেমে গেছে। উঁচুতে তো উঠলাম, কিন্তু নীচে নামার আগেই হৃদপিন্ড ছলাৎ করে উঠল, বুকের মধে 'দ্রিম দ্রিম' মাদল বেজে উঠল। একী অপূর্ব, একী অপরূপ দৃশ্য! গাঢ় নীল একঢালা মেঘ, আধো অন্ধকার, চারপাশে সবুজ আর নীলের লুকোচুরি খেলা, দুধারে দিগন্ত বিস্তৃত না হলেও অনেক দূর অবধি চোখ-জুড়ানো খোলা মাঠ! আর কি কি দেখলাম ঠিক বলতে পারব না। কারণ আমার মস্তিষ্ক তখন কাজ করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে--- শুধু হৃদয়ই ভরসা। হাত প্রায় স্টিয়ারিং থেকে উঠে যায়। কোনরকমে সম্বিত ফিরে ছেলেকে বললাম, 'সাবর্ণ, দেখ কী সুন্দর, কী সুন্দর!' ছেলে হাতের সেলফোন থেকে এক ঝলক চোখ তুলে বলল, 'Yeah, it's nice!' আমি তো হতবাক! 'It's Nice!' ব্যস্? হয়ে গেল? এরা কী দুর্ভাগা, কত unfortunate! এরা প্রকৃতির এমন রূপ দেখেও ভোলে না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে না। কিন্তু আমার তখন এসব জাগতিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা ভেবে সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। আমি ততক্ষণে আবার প্রেমে পড়ে গেছি! মনটা ফুরফুর করছে--- রোম্যান্সে ভরপুর! হিউস্টন, আমার হিউস্টন! ঠিক যেমন কলকাতা, আমার কলকাতা!

এদিকে ততক্ষণে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। গাড়ির CD player-এ আলতো হাত ছুঁইয়ে 'মান্না দে'-কে অনুরোধ করলাম গাইতে 'রিমঝিম ঝিম বৃষ্টি, মাটির কানে কানে, কি কথা নিয়ে পড়ে ঝরে ঝরে- আমার সারাদিন কিভাবে কেটে যায়--- শুধু তুমি, তুমি, তুমি তুমি করে---'! গানটা শুনতে শুনতে আর চারপাশ দেখতে দেখতে এতটাই রোম্যান্টিক হয়ে পড়লাম যে নিজের জীবন তুচ্ছ করে, হাজার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সুদীপ্তকে একটা text করে ফেললাম। সেই text-এর উত্তর যদিও প্রায় দুঘন্টা পরে Hillcroft ঘুরে Katy-তে বাড়ি ফিরে আসার পর পেলাম। অনেকে হয়ত পায়ও না উত্তর--- এইভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম! বাকি হিসেব পরে হবে।

যাইহোক, আমি ততক্ষণে Richmond-এর ট্যারাবেঁকা খানা-খন্দ ভরা রাস্তায়। মন আনন্দে ভরে উঠল। এই তো আমার হাজার হাজার মাইল দূরে ফেলে আসা কলকাতা! ধন্যবাদ হিউস্টন! আমি, আমার মতো অসংখ্য 'কলকাতাপ্রেমী'কে মন-কেমনের হাত থেকে অহরহ বাঁচাও তুমি। আহা--- কী সুন্দর! রাস্তার কী বাহার! জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে, গাড়ি অল্প পড়ছে, আবার উঠছে! মাঝে মাঝে পাশের লেনে টাল খেয়ে যাচ্ছে! কিন্তু পরোয়া করি না! আমি তখন একহাতে স্টিয়ারিং ধরে, অন্য হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবং অপরূপ facial expression দিয়ে, এক জায়গায় বসে যতটা নাচা সম্ভব নাচতে শুরু করেছি 'রিম ঝিম ঝিম বৃষ্টি---'র সুরে সুরে, তালে তালে। হঠাৎ দেখি পাশের লেনে signal-এ দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির চালক একজন সাদা ভদ্রলোক আমার দিকে হাসি হাসি মুখে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এবং আমার স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যশৈলীতে এতটাই মুগ্ধ এবং এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছেন যে পাশ থেকে চলে যাবার সময় আমায় একগাল হেসে ওনার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, মাথা নেড়ে, চলন্ত গাড়ি থেকে যতটা সম্ভব apprieciate করে গেলেন। ওনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ! কিন্তু চলে যাওয়ার সময় এক পলকে ওনার চোখের ভাষা চকিতে পড়ে নিয়েছিলাম। যদি না আমার ভুল হয়ে থাকে, সে চোখ বলছিল, 'এই বদ্ধ উন্মাদ কোন দেশের আমদানী!'

'প্রেম' দিয়ে যে লেখার সূচনা--- 'উন্মত্ততা' দিয়ে সে লেখা শেষ করছি। হয়ত ভাবছ যে লিখতে লিখতে বিপরীত মেরুতে চলে গেছি! না, যাইনি! কারণ বৃত্তের শুরু আর শেষ একই বিন্দুতে মেলে। আপাতভাবে মনে হয় দূর- কিন্তু একই বিন্দুতে এই দুই অনুভূতির মিশেল ঘটে। এইদুটো শব্দ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে উন্মত্ততা আছে; সোজা কথায় পাগলামি আছে। যেখানে পাগলামি নেই, সেখানে জানবে প্রেমও নেই!

সুপার মায়ের ডুপার দৌড়

বলাকা ঘোষাল

বুধবার দিন সকালে টিচার লাউঞ্জে ঢোকামাত্র গজগজে গুঞ্জনে কান বনবন করতে লাগল দেশী গিন্নীর। কে কালকে বাড়িতে পাক্কা আধঘন্টা ধরে রান্না করেছিল, সাত সকালের ট্র্যাফিক্ দেখে কার শরীর ঝিমঝিম করতে লেগেছে, কার এত স্কুলের কাজ ছিল যে দুটো কাপ নাকি এখনও কিচেন সিঙ্কে পড়ে আছে, এদিকে বিকেলে নতুন বয়ফ্রেন্ড এসে দেখে ফেললে কী লজ্জার ব্যাপারই না হবে, 'টু গো' ডিনার আজ নাকি না আনলেই নয়, শুক্রবার কেন এত দেরীতে আসে, কাদের হ্যাপি আওয়ারে গিয়ে একটু বিয়ার না চড়ালে চলে না, কে বাড়িতে এত স্ট্রেস্ নিয়ে ফেরে যে বাড়িতে সবাইকে বলে রেখেছে 'ডোন্ট মেস্ উইথ্ মি', ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশী গিন্নীর কাছে এসব আর তেমন কানে লাগে না, এ তো নিত্য আলোচনা।

যতক্ষণ নানা সুর চলতে লাগল, তিনি ততক্ষণে ফ্যাক্স মেশিনে কাগজ চড়িয়ে, নম্বর টিপে দিয়ে আরেক রাউন্ড কফির জন্য পটটা চালু করে দিলেন। আর মনে মনে ভাবছেন যে তাঁর ডিনার বানাতে রোজ কতক্ষণ সময় লাগে। আর বাসনই বা কটা জমে আছে সিঙ্কে। ভাগ্যিস বয়ফ্রেন্ডের চক্কর নেই এই বুড়ো বয়সে! কিন্তু উইকএন্ডটা এমন ব্যস্ততায় কেটেছে যে কাচা জামাকাপড়গুলো আর ভাঁজ করা হয়নি। কাঁচা বাজার কোনরকমে ফ্রিজে তোলা হয়েছে কিন্তু বাকি মুদি বাজার প্যান্ট্রির মাটিতে থলির মধ্যে বসে আছে মুক্তির অপেক্ষায়। তারই মধ্যে আবার ফিয়েস্তায় কচুর লতি সস্তায় পাওয়া গেছে, সেটা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই জম্পেশ করে একটা নামাতে হবে, বরকে চমকে দেবার জন্য। উফ্, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টটাও নিতে হবে সামনের সোমবার।

মনের মধ্যে যে এত কিছু চলছে বাইরে থেকে তার এতটুকু আঁচ করবার যো নেই। সহকর্মীদের প্রাণের উচ্ছ্বাসে 'হায়' বলে, তাদের চুল বা স্কার্টের প্রশংসা করে, ট্র্যাফিকের বিস্তর নিন্দেতে সায় দিয়ে, দুনিয়ার কিছু শোনা কথা নিয়ে চোখ কপালে তুলে 'ক্যান্ ইউ বিলিভ্ ইট্' বলে আবার তিনি কর্মকান্ডে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই দেশে ভারতীয় মহিলারা অফিসে প্রফেশনাল্ ইমেজ্ আর বাড়িতে দেশী গিন্নীর খেতাব- এই দুই মিলে কীরকম খিচুড়ি পার্সোনালিটিটা বানিয়েছে। গোরা-অগোরা মেমরা আমাদের এই দুই নৌকায় পা রেখে দিব্যি ভবসাগর পার হবার নমুনা দেখলে তাদের চোয়াল কোথায় ঠেকবে! আর যদি তিন দিনের জন্যও যাদুবলে ভারতীয় রমণীর রোল্ প্লে করতে হয় তো নির্ঘাৎ তিনদিনের মাথায় হাসপাতালে বা অ্যাসাইলামে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে ঘড়িটার দিকে তাকাতে ভয় লাগে- মারফির নির্মম নিয়মের দুনিয়ায় ওই উঠে পড়বার সময়েই ঘুমটা ভাঙে। অতএব, জয় মা দুর্গা, ভাগ্যিস তোমার দশটি হাত আছে, তাই তো সারাদিনে যখন তখন চাইলেই এক্সট্রা হাত পেতে অসুবিধা হয় না।

ভারতীয় রমণীদের কাজের নমুনা অনেকটা এই রকম- রিকোটা চীজ্ দিয়ে সন্দেশ বানাতে বানাতে লেস্ন্ প্ল্যানের খসড়া প্রস্তুত। বাগানে গজানো কুমড়ো, বেগুন দিয়ে চচ্চড়িটা কষতে কষতে মিটিং-এর মিনিট্স্ ঝটাপট ড্রাফ্ট্ করে ফেলে, ফেস্বুকে একটু গুলতানি সেরে, কানে ফোন গুঁজে দেশে মা বাবার খবরাখবর নিয়ে, বাড়ির সবার টিফিন গুছিয়ে, রান্নাঘর ঝকঝকে তকতকে না করা অবধি মনে হয় না যে কিছুই করা হল। এরই ফাঁকে অন্লাইন্ সাইট্ ঘেঁটে ছেলের স্প্যানিশ ক্লাসের কিউবান্ রেসিপিটা ডাউন্লোড করে নিয়ে কালকের টু ডু লিস্ট তৈরী হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের নানান রকমের ক্লাসে হয় পৌঁছনো, নয় তোলা, হোমওয়ার্ক করানো, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা তবলার তালিম, মাতৃভাষাটা রগড়ানো, ব্যবহার নিয়ে একটু জ্ঞান দেওয়া, বেড্-টাইমের গল্প আর খুনসুটি, তারপর তাদের স্কুলের ডজন খানেক ফরমায়েশ তো আছেই। টিচারদের সাথে ই-মেলে সংলাপ, উইক্-এন্ডে পার্টির রান্নার প্ল্যান, আবার মাকে খুঁচিয়ে সিক্রেট্ মশলাটা জেনে নেওয়া। কার কবে জন্মদিন গেল, বা এই হবে- সেইসব প্ল্যান মাফিক মল্ থেকে ডিল্ দেখে বাজার করা। নিজের জন্য সেই সুবাদে একটু শপিং। স্ট্রেস্? স্ট্রেসের বাবাও পালাবে এই কাজের বহর দেখে। গোটা আমেরিকায় এহেন দশভুজা লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি নিমেষে, একেবারে ট্র্যাফিক্ জ্যাম্ হয়ে যাবে।

সুখী মেম যেখানে কোমল ডেইজির মতন বেলা বাড়লেই রোদের তাপে কাৎ, দেশী মহিলারা সেখানে শুকিয়ে ঝুরো তো নয় বটেই, বরং যেন কোমর বেঁধে রণে নেমেছেন। তবে তাঁরা সুখী কিনা জানা মুশকিল। কিন্তু সংসারে দক্ষতার রণক্ষেত্রে ঐ পারাটাই বড় কথা। ওই কাজের মহাসমুদ্রে নাকটা ঢেউয়ের উপর জাগিয়ে রাখাটাই আসল! মার্কিনী মহিলারা যখন শুক্রবার বাইরে ডিনার সেরে, বাড়ি ফিরে হাই হীল খুলে বাথটবে মদিরার পেয়েলা নিয়ে একটু টান হবেন, দেশী গিন্নীরা তখন ফর্মুলা ওয়ানের ট্র্যাকে স্পীড্ তুলছেন।

তাই এই সুপার মায়েদের কাজ কক্ষনো শেষ হবার নয়। কেননা, দেড় মিনিট টাইম পেলেই তাঁরা কোনও সামাজিক দায়িত্ব বা সখ চাপিয়ে নেবেন নিজেদের ঘাড়ে। এই সুপার মায়েরা অফিসে ওপ্রা উইনফ্রে, স্কুলে সেরা পেলিন্, আর বিকেলে বাড়িতে ফিরে বাড়ি-বোঝাই কাজ সারতে সারতে একাধারে 'খেঁদির মা' আর মার্থা স্টুয়ার্ট, আর উইকএন্ডে কতকটা ইন্দিরা গান্ধী আর বাকিটা মা অন্নপূর্ণা। দুনিয়ার দুই দিকের পোশাক-আশাক, গয়নাগাঁটি, মেক্ আপের কারিগরি, রেসিপি আর বাসনপত্র (প্রেসার কুকার থেকে সিলিকন্ বেকিং ডিশ অবধি), ভাটিয়ালি থেকে রক্ অ্যান্ড রোল্- পৃথিবীর এই দুপারের ব্রিজ বানিয়েই চলেছে। ওদিকে মা দুর্গা দৌড়চ্ছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের-বাড়ি আর নিজের বাড়ি, মমতা দৌড়চ্ছেন লালদীঘি থেকে জেলা তহসিল আর দিল্লী! আর এই জগদ্ধাত্রীরা একেবারে সুপার মম্- তাদের এক হাতে সেল্ ফোন্, এক হাতে খুন্তি, আরেক হাতে আধুনিক নভেল, অন্য হাতে ল্যাপ্টপ্, পঞ্চম হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং, ষষ্ঠ হাতে নাচের মুদ্রা, সপ্তম হাতে ঝাড়ন-ঝাঁটা-বালতি আর অষ্টম হাতে ডলার। সবার

নীচের দুহাতে অবশ্যই দুই ছেলে-মেয়ে; তাদেরও এই সুপার-ডুপার মায়েদের পাশে পাশেই দৌড়ের তালিম শুরু।

·•●❖●•·

রবিবার
উদ্দালক ভরদ্বাজ

একটা সময়ের পরে
ভালবাসাটা বাড়তি।
একটা সময়ের পরে
কাছে আসাটা ফালতু,
সময় নষ্টের মত।

তবুও রবিবার দুপুরে
ঘরদোর, সাজান ফরাস
আর রকমারি বাজারের মধ্যে
দু'দন্ড বসলে-
এক পশলা জলের মত কারো চোখ,
এক লহমা সুখের মত
এক বুক হারান দুঃখ
গলার কাছে দৌড়ে আসে।

মেঘ মেঘ দিন,
সবুজ গাড়ি,
আলোছায়া ড্রাইভ-ওয়ের পাশে
আনমনে বসা পাখি
ডেকে যায় অনুপম স্বরে-
''অনুরাগের প্রহর
ভুলে গেছ বুঝি?''

বলে সে উড়ে যায়;
আদিগন্ত ছড়ান
নীলাভ মেঘের প্রাসাদ ছুঁয়ে,
প্রেরণার নিশ্চিত গহ্বরে।

আমি ফিরি
বকেয়া জীবনে।

·•●❖●•·

টক ঝাল মিষ্টি
অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

'বাড়ির কাজ করতে বললে গায়ে জ্বর আসে! এদিক থেকে ওদিক কুটোটি সরাবে না। বাজার করে আনতে বললে বেছে বেছে পচা আলু, পচা পেঁয়াজ, খেকো আম- এইসব কিনে আনবে। আর আমার যদি কোন জিনিস কিনতে গেল- কী করে যে ওইসব চোখে পড়ে ভগবান জানেন! পছন্দের কী ছিরি---!' তারস্বরে চিৎকার করতে করতে তনিমা ছ্যাঁক করে ফুটন্ত তেলে কাটা সব্জীগুলো ছাড়ল। তিমির নির্বিকার চিত্তে ক্রিকেট খেলা দেখছিল। তনিমার চিৎকার-চেঁচামেচি অনেকক্ষণ থেকে খেলা দেখায় ব্যাঘাত ঘটালেও সব সহ্য করছিল শচীনের আলটপ্কা তীরের বেগে বাউন্ডারি হাঁকানো দেখতে দেখতে।

তিমিরের ক্রিকেট খেলা দেখার নেশা আজকের নয়- সেই ছোটবেলা থেকে। হুগলী জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে তিমিরের বড় হওয়া। তিমির যখন মাধ্যমিক পাশ করেছে তখন গ্রামে টিভি থাকা দূরে থাক্, বিদ্যুতের আলো পর্যন্ত ছিল না। প্রায় আট-নয় কিলোমিটার দূরে, দু-তিনটে গ্রাম পেরিয়ে একটা কোল্ড স্টোরেজে গিয়ে তিমিরের প্রথম টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখা। তারপর কলকাতায় কলেজে পড়তে গিয়ে ভারতের প্রায় কোন ক্রিকেট ম্যাচ্ই টিভিতে দেখা তার বাদ পড়ত না। পরবর্তী জীবনে টিভির কেব্ল্ নেট্ওয়ার্ক কানেক্শন্ নেবার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের ক্রিকেট ম্যাচ্ দেখা।

এহেন ক্রিকেট-পাগল তিমিরের খেলা দেখা তনিমার কোনদিনই পছন্দ নয়, কারণ খেলা থাকলেই সিরিয়ালগুলো একেবারে মাটি হয়ে যায়। তিমিরের মতে 'ঘর ঘর কি কহানী', 'কিঁউ কি সাঁস ভি কভি বহু থী'- এসব নাকি পারিবারিক কেচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আগের দিন বৌদির সঙ্গে দেওরের মাখো মাখো সম্পর্কটা দাদার কানে পৌঁছনো অবধি দেখিয়েই যে ইতি টেনে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা করে ছাড়ল, সেটা আজ না দেখা অবধি তনিমার শান্তি নেই। আর ওদিকে অক্লান্ত সৈনিক শচীনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে। তিমির যত চুপচাপ খেলা দেখতে থাকে, তনিমা তত খানিকক্ষণ পরে পরেই চেঁচামেচি করতেই থাকে। 'এমন আলু কেউ কিনে আনে, যে আলু রাস্তায় পড়ে থাকলেও কেউ ছোঁবে না, তাকে কিনে আনা! পয়সা সস্তা? এর বেলায় পয়সা নষ্ট হয় না? যত পয়সা নষ্ট আমার কিছু কেনার শখ হলেই! এমন কারো পছন্দ হয়?' আবার সেই পচা আলু, পচা পেঁয়াজের অভিযোগ। তিমির আর থাকতে না পেরে শুধু বলে- 'হ্যাঁ, আমার তো সব পছন্দই খারাপ, আর তোমার সব ভাল!' ব্যাস, আর যায় কোথায়! তনিমা যেন এই উত্তরের জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। যা চিৎকার করছিল তার তিনগুণ গলা চড়িয়ে বলতে শুরু করে- 'হ্যাঁ তাই। কী দেখাবে তুমি? খাবার ঘরের চায়নাতে সাজিয়ে রাখার জন্য শ্বেত পাথরের হাতি কিনে আনলে! তার এমন চেহারা, এমন দাঁত- আমার কেনা ঐ ছোট্ট মডেল অশ্বত্থ গাছের নীচে এমন বেমানান লাগল যে শেষে নিজেকেই সরিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে

রাখতে হ'ল! ক'টি বলব?' তনিমার বাক্য-বর্ষণ চলতেই থাকে। তিমির তখন ভারতের জয় প্রায় নিশ্চিত করেই ফেলেছে। সীমিত ওভারের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এটা ভারতের উপর্যুপরি তৃতীয় জয়, তার সঙ্গে শচীনের দুর্দান্ত সেঞ্চুরী- সব মিলিয়ে মনটা বেশ খোশ মেজাজে আছে। তনিমাকে উদ্দেশ্য করে একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারল না,- 'হ্যাঁ আমার পছন্দ কেমন সে তো বোঝাই যাচ্ছে!' তনিমা- 'বোঝা যাচ্ছেই তো! আর কী বোঝাবে? হাঁ করে খেলা দেখছ তাই দেখ। আমি সবসময় সেরা পছন্দ করে আনি, আর তুমি- পচা।' শেষকালে আর না পেরে তিমির ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল- 'কে কাকে পছন্দ করেছিল? আমার পছন্দ পচা না হলে কি আর কপালে এই জোটে? তোমার পছন্দ সেরা স্বীকার করতেই হবে---!' তনিমা কিছুক্ষণ সময় নিল বুঝতে- তারপর খুন্তি নিয়ে তিমিরের ওপর প্রায় ক্রুজ্ মিসাইল নিক্ষেপণের হুংকার, 'সারা জীবনে সেরা ওই একটিই পছন্দ করেছিলে, আর আমারও পছন্দে তুমিই ব্যতিক্রম।' কঞ্চি নুইবেই না, ভাঙা তো দূর অস্ত!

এই করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল। আর কিছুক্ষণ পরেই নীল স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবে। তিমির দেখল সামনের টেবিলে চা এসেছে। বিস্কুটের ডিবেও হাজির। পাশে মুড়ি-চানাচুরের পাত্রও বর্তমান। আজ সন্ধ্যেবেলায় অফিসের বাৎসরিক অনুষ্ঠান। তাই অফিস ছুটি থাকে প্রত্যেক বছর, নভেম্বরের শেষ শুক্রবারে। সেই অনুষ্ঠানে তনিমা তিমিরের সঙ্গে একটা ছোট্ট শ্রুতিনাটকও করবে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। একটু চর্চা করে নেওয়া দরকার নীল আসার আগে। তিমির ভাবল বাড়ির আবহাওয়াটারও একটু পরিবর্তন না হলেই নয়। কলকাতায় শীতের শুরুতে সকালের এই মিঠে রোদটা বেশ রোম্যান্টিক মনে হয় তিমিরের। তনিমাকে একটু খুশী করার জন্যই বলল- 'বাইরের রোম্যান্টিক রোদের আলোয় তোমাকে আজ একটু বেশীই সুন্দর লাগছে। এসো না, একটু নিরিবিলিতে গল্প করি।' তনিমা শান্তস্বরে বলল- 'থাক, আর আদিখ্যেতা না করে চা খেতে এস। বেলা ক'টা বাজল খেয়াল আছে?' তিমির এসে তনিমার পাশে বসে চায়ে চুমুক দিল। চারতলার ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টের বসার ঘরের জানলা দিয়ে যে বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটা দেখা যায়- নীলদের খেলার পার্কের ধারে- সেটাতে সুন্দর লাল রঙের ফুল ধরে আছে। আকাশটা একটু বেশী রকমের নীল লাগছে যেন। চড়ুইপাখীগুলো নিরবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতায় এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে গিয়ে বসছে। দুজনে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন দিয়ে উপভোগ করতে করতে চা-জলখাবার প্রায় শেষ। তিমির দেখল তনিমা ইতিমধ্যেই শ্রুতিনাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে হাজির।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালিদের শতকরা নব্বইভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কটা মোটামুটি এই রকমই- এই ঝগড়া- এই ভাব। তিমির তনিমার সম্পর্কও সেইরকমই। তিমির একটু সহজ-সরল, সাদা-সিধে বলে সোসাইটিতে কেউ তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করলে- তনিমার বিচক্ষণতায় ঠিক সে তিমিরকে সাবধান করে দেবে। তিমিরের প্রতি অপমানজনক কথাবার্তা তিমির হজম করে নিলেও তনিমা কিছুতেই তা মেনে নেবে না। গতবার পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে ৫৬ নম্বরের বিমানদা তিমিরকে কী যেন বলেছিলেন, ব্যাস, তনিমা সেই থেকে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিল।

এই প্রেম-বিবাহ-সন্তান-কলহ-বিবাদ-বিতর্ক চক্রে যখন আবার প্রেম ফিরে আসে তার মাধুর্য্য অনেক বেশী। যে প্রেম সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতকে জয় করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে- সেই বোধহয় আসল প্রেম।

শ্রুতিনাটকের মহড়া দিতে দিতে তিমির-তনিমা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। হঠাৎ খেয়াল হয় বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা- নীলকে স্কুল-বাস-স্ট্যান্ড থেকে আনতে যেতে হবে। তিমির তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ে। তনিমা আবার সংসারের কাজে মন দেয়। গুনগুন করে আপন মনে গান ধরে- 'আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে।'

এ এক আশ্চর্য কুসুম, তবু...

গীতাঞ্জলি ভট্টাচার্য্য বঙ্গ

আমার সমস্ত জীবনানুভূতির কল্পনা তুমি
তুমি আমার ভয়, স্বপ্ন, আনন্দ চেতনা
তুমি আমার আপন অস্তিত্বের স্বীকৃতি।
স্বপ্নের জগৎ থেকে মায়া মেখে সত্যের
ভূমিতে পদক্ষেপে ধন্য করো, হে ফুল্ল কুসুম!
যুগে যুগে সকল প্রেমিক প্রেমিকার ক্রোড়ে
তোমার আগমন। জীবন ছন্দের আবর্তনে
আত্মস্বরূপ তুমি।

আমার সমস্ত সত্তা কেঁপেছে
সুখে বেদনায় তোমার অস্তিত্বে।
আশ্চর্য বিস্ময়ে বিহ্বল হয়েছি
সমস্ত যৌবনের বেদনা মুকুলিত হয়ে
প্রস্ফুটিত হয়েছে তোমাতে।
তুমিই আমার পৃথিবী।

মনে হয় ব্যগ্র বাহু মেলে ধরে রাখি।
অথচ তারায় তারায় তোমার আহ্বান।
ঋতু তোমায় ডাকে বৎসরের রূপসজ্জা
নিয়ে। তোমায় নিয়ে এত বেদনা তবু
তোমায় আমার নিজের চেয়েও
ভালবেসেছি কি? তোমার দুঃখে সুখে
ব্যথা বেদনায় উদ্বেল হয়েছে কি এ
সাগর হৃদয় নিজের বেদনার চেয়েও?

ধ্রুবতারা

শুক্তি দত্ত

আকাশের উত্তর কেন্দ্রে যে তারকাটি জ্বলজ্বল করে তারই নাম ধ্রুবতারা (Pole Star)। এই তারাকে লক্ষ্য করে নাবিকরা দিক নির্ণয় করে। ধ্রুব কথাটার মানে স্থির, নিশ্চিত। আমি জানি এটা ধ্রুব সত্য- অর্থাৎ সত্যে কোন সংশয় নেই, অথবা আমার ধ্রুব বিশ্বাস অর্থাৎ অটুট বিশ্বাস। ধ্রুবতারার জন্মকথার শুরুতে বলতে হবে মনুর কথা। মনু ব্রহ্মার দেহ হ'তে উদ্ভূত। তাঁরই পুত্র কন্যা থেকে মনুষ্য জাতির বিস্তার, তাই তারা মানব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি- এই চার যুগের সহস্র যুগে অর্থাৎ মোট চার সহস্র যুগে ভগবান ব্রহ্মার এক দিন। ঐ এক ব্রহ্মাদিবসে চতুর্দশ জন মনু জন্মগ্রহণ করেন। এক মনুর অধিকার কালকে মন্বন্তর বলে। মন্বন্তর কাল পূর্ণ হলেই মনুপুত্ররা সকলেই বিলুপ্ত হ'ন এবং নতুন করে অন্য মনু-দেবতা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। মনুদের মধ্যে যিনি আদি, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু, তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র।

স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের দুই রাণী ছিল- সুনীতি আর সুরুচি। রাজা সুরুচিকে সুনীতি অপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। সুরুচির প্ররোচনায় তিনি সুনীতির প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি সুনীতিকে বনবাস দেন। সুনীতি যখন বনবাসে কাল কাটাচ্ছেন তখন রাজা উত্তানপাদ একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে পথভ্রান্ত হয়ে সুনীতির নির্জন কুটীরে উপস্থিত হ'ন এবং সেখানে রাজ সহবাসে সুনীতির গর্ভে ধ্রুব জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানপাদের রাজপুরীতে সুরুচির গর্ভে জন্ম হয় উত্তমের। কয়েক বছর পর ধ্রুব পিতার সাথে দেখা করতে রাজসভায় যান, সেখানে উত্তমকে পিতার কোলে বসে থাকতে দেখে খুবই উত্তেজিত হয়ে নিজেও পিতার কোলে বসার আব্দার করলে বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে অত্যন্ত অপমান করে বিতাড়িত করেন। ধ্রুব মায়ের কাছে গিয়ে এই অপমানের কথা সবিস্তারে বলেন। সব শুনে সুনীতি বলেন, 'হরি-ই একমাত্র তোমার এই দুঃখ মোচন করতে পারেন। তুমি তাঁকে মন-প্রাণ দিয়ে ডাকো।'

যে হরির দয়ায় মানুষের মঙ্গল হয়, ধ্রুব সেই হরিকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। একদিন গভীর রাত্রে তিনি তাঁর ঘুমন্ত মাকে ছেড়ে হরির অন্বেষণে গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন। পূর্বদিকে যেতে যেতে ধ্রুব সাতজন ঋষিকে দেখতে পেলেন। ধ্রুব তাঁদের বললেন, 'আমি অর্থ বা রাজ্য কিছুই চাই না। আমি এমন স্থান প্রার্থনা করি যা কেউ কখনও উপভোগ করেনি।' এই সাতজন ঋষি 'সপ্তর্ষি' নামে খ্যাত। এঁরা সকলে ব্রহ্মার মানসপুত্র। আকাশের ঈশান কোণে এঁরা অবস্থান করেন। সেই সাত ঋষির মন্ডলী 'সপ্তর্ষি মন্ডল' নামে পরিচিত। এই সপ্ত ঋষির নাম মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। এঁরা ধ্রুবকে বললেন বিষ্ণুর আরাধনা করলে ধ্রুব'র এই ইপ্সিত স্থান পাওয়া যাবে।

ধ্রুব তখন বিষ্ণুর আরাধনায় কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা এই কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে নানা উপায়ে ধ্রুব'র তপস্যা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং অবশেষে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে ধ্রুব'র কাছে এসে বললেন, 'আমিই হরি, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি, বর গ্রহণ করো।' ধ্রুব বললেন, 'আমি যেন আপনার স্তব করতে পারি- এই বর আমাকে প্রদান করুন।' বিষ্ণু বললেন, 'পূর্বে তুমি এমন একটি স্থান প্রার্থনা করেছিলে যা পূর্বে কেউ উপভোগ করেনি। তুমি বহু পূর্বে এক ব্রাহ্মণ-পুত্র ছিলে, তোমার এক বন্ধু রাজপুত্রের ঐশ্বর্য্য দেখে তুমি রাজার পুত্র হতে চেয়েছিলে, তাই তুমি রাজা উত্তানপাদের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছ। আমার আরাধনা করে এখন তুমি মুক্তি পেয়েছ। সকল গ্রহ নক্ষত্রের উপরে তুমি তাদের আশ্রয় স্বরূপ হয়ে থাকবে। এই স্থানের নাম হবে 'ধ্রুবলোক'। এর পর ধ্রুব পিতার রাজ্য লাভ করেন। বিবাহ করে সংসারী হ'ন। তাঁর দুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যথাকালে ধ্রুব দেহত্যাগ করলে বিষ্ণুদত্ত ধ্রুবলোকে প্রস্থান করে নক্ষত্ররূপে অবস্থান করতে থাকেন। আজও আমরা উত্তরাকাশে যে জাজ্বল্যমান তারাটিকে দেখতে পাই, সেটিই ধ্রুবতারা।

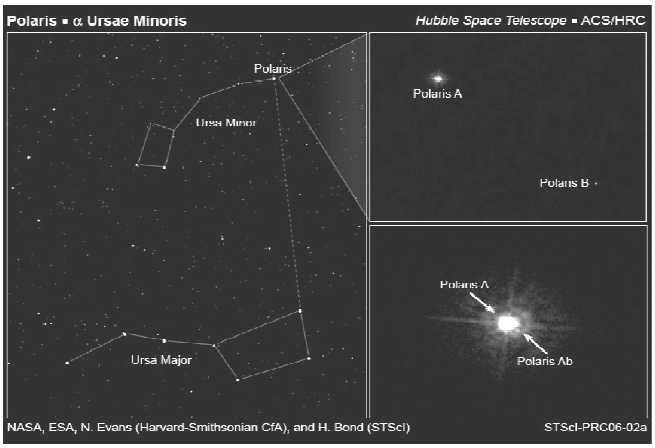

সাক্ষী

সুজয় দত্ত

হাজার তারার জন্ম দেখেছি আমি
মহাশূন্যের অতল অন্ধকারে,
তাদের আলোয় হইনি উদ্ভাসিত
রয়ে গেছি চির-আঁধারের পারাবারে।

হাজার কুসুম ফুটতে দেখেছি আমি
এ মহাজীবন-বৃক্ষের শাখে শাখে,
গন্ধে তাদের হইনি তো সুরভিত
গন্ধহীনের লজ্জা আমায় ঢাকে।

হাজার খুশীর ঝিলিক দেখেছি আমি
কত বিজয়ীর অভিষেক উৎসবে,
পারিনি ছিনিয়ে আনতে জয়ের মালা
হার-মানা হার- সে শুধু আমারি রবে।

হাজার নদীর উৎস দেখেছি আমি
তুষারগুহায় ঘুম ভাঙা নির্ঝরে,
চলে গেছে তারা মোহনার পথ চিনে
আমি দিশাহীন বেদনার বালুচরে।

হাজার আশার প্রদীপ দেখেছি আমি
এই পৃথিবীর কত সুখী গৃহকোণে,
সে-দীপের আভা স্পর্শ করেনি মোরে
ব্যর্থ এ-প্রাণ হতাশার জাল বোনে।

তবু তো এখনো বাকি রয়ে গেছে দেখা
কত প্রতিশোধ, নিষ্ঠুর হানাহানি,
মানুষের বেশে মত্ত শোণিত-পানে
হিংস্র লোলুপ মনুষ্যেতর প্রাণী।

আরো দেখা বাকি হৃদয় কেমন করে
পণ্য হয়েছে পৃথিবীর এই হাটে,
স্নেহ-মায়া-প্রীতি আশা-ভালবাসা সবই
রোজ বলি যায় লালসার হাঁড়িকাঠে।

দেখে যাব আমি, অন্ধ মানুষ ছোটে
উড়িয়ে কেতন অগ্রগতির রথে-
বুঝেও বোঝেনা কোন্ নিয়তির টানে
এগিয়ে চলেছে সর্বনাশের পথে।

সে-পথের ধারে জীর্ণ কুটীরে আমি
রইলাম পড়ে অবহেলিতের দলে।
শেষ বিদায়ের ঘনাবে সময় যবে
যা দেখেছি মোর কবিতায় যাব বলে।

মানুষ বাঙ্গালী

শেলী শাহাবুদ্দিন

এক

শুনেছ তোমরা নতুন দিনের বাংলার বিস্ময়?
বাঙ্গালী আবার দিয়ে গেল তার মানবিক পরিচয়।

একাত্তরে দেখেছি আমরা বিস্ময় আর ত্রাসে,
বাঙ্গালীর হাতে বাঙ্গালী হত হয় অনায়াসে!

তাই আমি ভাবি, কবে মরে গেছে বাঙ্গালীর ভালবাসা;
বিজাতীয় এক ভূত কাঁধে নিয়ে লাশ করে যাওয়া-আসা।

সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে শুনি পিশাচের কোলাহল,
হত্যা, ধ্বংস, লুণ্ঠন আজ বাঙ্গালীর মহাবল।

ভাবি তাই আমি, মরে শেষ হয়ে গেছে, লালনের মানুষেরা;
সহজ মানুষ, ভাবুক বাঙ্গালী- কোথায় লুকালো তারা?

দুই

ভয়ানক এই দুঃস্বপ্নের মহাকাল শেষে দেখি,
মোটেই মরেনি বাঙ্গালী আজিও, মহা বিস্ময় একী!

'সাভার' নামের লোকালয়ে আজ মৃত্যুর মহাশোক,
মানুষ বাঙ্গালী জেগে উঠে সেথা জ্বালায় জ্যোতির্লোক।
শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র- গ্রামের গরিব মানুষ যত,
এনেছে খাবার, তৃষ্ণার জল- যে যার সাধ্যমত।

মৃত কিশোরীর মুঠোয় চিঠিতে বার্তা এনেছে বয়ে,
'ভাইয়া আমার, বাবারে, মায়েরে দেখিও আমার হ'য়ে;
মাগো, আমায় ক্ষমা করে দিও, মরে আজ যদি যাই,
ওষুধ কিনিয়া পারিব না দিতে কোনদিন আর তাই।'

বাঙ্গালী যুবক খুঁজে পায় লাশ, অতি প্রিয় ছোট বোন;
ক্ষণকাল বসে মৃত বোন পাশে মোছে সে চোখের কোণ।
হামাগুড়ি দিয়ে মৃত্যুগুহায় ঢোকে সে কঠিন শ্রমে,
ঘাড়ে নিয়ে ফেরে অজানা বোনেরে পরাস্ত ক'রে যমে।

বুকভরা তার এত ভালবাসা, ঝাঁপ দিয়ে বারবার,
মৃত্যুগুহায় যাতায়াত তার, চেয়ে দেখো একবার।
শত শত এই 'মানুষ বাঙ্গালী' অপরে বাঁচাতে চায়,
বহু মানুষেরে বাঁচাবার তরে তারই বুঝি প্রাণ যায়।

কত সাধারণ মানুষ বাঙ্গালী, 'কায়কোবাদ' সে নাম,
পরার্থে পুড়ে, কত যন্ত্রণা সয়ে ছেড়ে গেল ধরাধাম।

সহজ মানুষ, বুকভরা তার ভালবাসা খালি খালি,
ওই তো আমার চিরচেনা সেই লালনের বাঙ্গালী!

সুন্দরী

গীতাঞ্জলি ভট্টাচার্য্য বঙ্গ

বেড়াতে যাচ্ছি গুজরাটে। আহমেদাবাদ স্টেশন, এটা স্টেশন তো নয় যেন কোন বড়লোকের আবাস-স্থল। কলকাতার লোক আমরা, আমাদের এটাকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হতেই পারে। যতটা বড় ততটাই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। ভারতবর্ষেও সুন্দর জায়গা আছে তাহলে! হঠাৎ মনে হ'ল এখান থেকে জয়পুর গেলে কেমন হয়! জয়পুরে তো কখনও যাওয়া হয়নি, এত কাছ থেকে ফিরে যাব, আর যদি না আসা হয় তো সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে। অগত্যা বাসের টিকিট কেটে জয়পুর যাত্রা করলাম। রাত্রিবেলা পথের দুধারের সৌন্দর্য দেখা হয়নি, কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই দুধারের সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। কচি সূর্যের গোলাপী আভা আর পথের রাঙা মাটি! পথের মাঝে মাঝে বড় বড় কূয়ো। কাঁটা আর বাবলা গাছের ঝোপ কিছু দূরে দূরে, দু-একটি কুটির, মাঝে মাঝে মার্বেল পাথরের স্তূপ। মনের আনন্দে ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে তীব্র কর্কশ স্বরে ক্যাঁও ক্যাঁও করে ডাকছে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে বাস থামল 'নাথ দুয়ারা'য় এসে। পাথরের কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করে সকাল হ'ল। বেলা দশটায় পৌঁছলাম জয়পুরে। বাস-স্ট্যান্ড লাগোয়া টাঙ্গা-স্ট্যান্ড। টাঙ্গায় ঘুরে ঘুরে লজের সন্ধান পাওয়া গেল, নাম রাজপুতানা লজ্। একতলায় পাশাপাশি দুটি ঘর, সঙ্গে অ্যাটাচ্ড্ বাথ্। লজ্টিতে বেশ একটি রাজকীয় ব্যাপার আছে। বড় বড় ঘর, বেশ কারুকার্য করা পুরনো ফ্যাশানের। প্রসাধনের জন্য মস্ত একটি বেলজিয়ান্ গ্লাসের আয়না ফিট্ করা ড্রেসিং টেব্ল্। দুটি ঘরেই ডব্ল্ বেডের কারুকার্য করা পালঙ্ক। একটি হাল ফ্যাশানের সোফা সেট্। সারাদিন ঘুরে শরীর বেশ ক্লান্ত, তাই লজের স্যুইট্ ভাড়া করে বাথরুমে ঢুকলাম, ফ্রেশ্ হয়ে খাবারের অর্ডার করলাম। তারপর বিছানায় পড়ামাত্র রাজ্যের ঘুম এসে ধরল।

অনেক রাতে, ক'টা বলতে পারব না, কী একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভাঙল। আবছা আলোতে দেখি আয়নার দিকে পিঠ দিয়ে আমার বিছানার এক কোণে এক সুন্দরী মহিলা করুণ চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ভুল দেখছি না তো? চোখ কচলে নিয়ে দেখলাম, না ভুল হয়নি, তবে ঘরের দরজা কি খোলা আছে? তাকিয়ে দেখলাম- না, ভেতর থেকে তো বন্ধ বলেই মনে হচ্ছে। তবে কি লজের মালিকের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এই মহিলা ঘরে ঢুকেছেন? ভিনদেশী মহিলা তো- ওদের আদব-কায়দা অন্য রকমের। কিম্বা ভোর হয়ে গেছে বোধহয় তাই ঘর পরিষ্কারের জন্য ঢুকেছে। কিন্তু দেখে তো মনে হয় না ঘর পরিষ্কার করার মেয়ে, কারণ সাজপোশাকে নিখুঁত পরিপাটি, রাজকীয় বেশ। পাশ ফিরে শুলাম, অতশত এখন ভাববার সময় নেই। কাল দেখা যাবে, আপাতত এখন ঘুমোই। পাশ ফিরেও শান্তি নেই। শুনি ফোঁস ফোঁস ফোঁপানির আওয়াজ। কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একে তো আমার ঘরে না বলে ঢুকেছে, তারপর মাঝরাতে বিছানায় বসে কান্নাকাটি। কোথাও ভুল হচ্ছে না তো? আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও মেয়েটি একইভাবে বসে আছে। নাঃ, উঠতেই হচ্ছে- যেই উঠে বসেছি, তখন দেখি কই কেউ তো কোথাও নেই! সঠিক কিছু বুঝতে না পেরে আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম আর আসে না- শেষে ভোররাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি। সকালে বয় এসে ঘুম ভাঙাল।

সারাদিন শহরে টাঙ্গায় চড়ে ঘুরে বেড়ালাম। রাজস্থান সত্যিই অতুলনীয়। ভাল করে জয়পুর দেখতে হলে মাস খানেকও কিছু নয়। তবু সন্ধ্যেবেলা বাইরে ঘুরতে ইচ্ছে হয় না। বেশ ক্লান্ত হয়ে যাই। তাই ফিরে এসে স্নান সেরে ডিনার করে নিলাম। গত রাতের ঘটনা যে ভুলে গেছি তা নয়, কিন্তু কীরকম যেন- বিশ্বাসযোগ্য তো নয় যে ব্যাখ্যা করা যাবে, হয়ত গল্প করলে সকলে হেসে উড়িয়ে দেবে। যদি কোন প্রমাণ দেখাতে পারতাম তো অবশ্যই লজের মালিকের কাছে কৈফিয়ত চাইতাম। একা ব্যাচেলার মানুষের ঘরে কেন বিনা অনুমতিতে মহিলা পরিচারিকা ঢুকবে? তবে ওকে কিন্তু পরিচারিকা বলা যায় না- কারণ অত সুন্দরী- সে কেবল রাণী হবার যোগ্য। দেখি আজ রাতটা কেমন কাটাই। হ্যাঁ, শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাই। আবারও অস্বস্তিতে ঘুম ভাঙল। বিছানার শেষপ্রান্তে পায়ের কাছে আবারও দেখি কালকের সেই মহিলাকে। তার চোখে জল। গতকালের মতই সেজে এসেছেন। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। মাঝরাতে কেন আসে আর কোন পথ দিয়েই বা আসে বুঝছি না! কি জানি কী মতলবে তার আগমন, বেশ ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করলাম। তার সুসজ্জিত মুখের করুণ দৃষ্টিটি, যা চোখের মধ্যে আঁকা হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করেও তার সেই দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি। সজল চোখের কী বক্তব্য তা আজও জানতে পারলাম না। আমার ব্যবহারে মনে হয় খুবই দুঃখ পেয়েছেন। সজল চোখেই উঠে চলে গেলেন, বুঝলাম না কোথায় বা কীভাবে গেলেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার মাথা গরম হয়েছে সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে। রাজকীয় লজে অবচেতনের কল্পনা থেকে ওসব দেখছি। আগামীকাল সারাদিন বাকি যা আছে সব দেখে নেব যাতে ফিরে এসে রাত্তিরে এক মুহূর্তও না জেগে থাকতে পারি।

আজ আমার সারাদিন ঘুরে বেড়াবার দিন, কারণ আমাকে ভীষণ ক্লান্ত হতে হবে। রাত জেগে আকাশ কুসুম ভেবে সুন্দরীর সঙ্গে দেখা করার কোন প্রয়োজন নেই। মাউন্ট আবু এখান থেকে বহু দূরের পথ, টাঙ্গা করে তো যাওয়া যাবে না, তাই ট্যাক্সি ভাড়া করে রওয়ানা হলাম। লজে আমার সমস্ত লাগেজ্ রেখে এসেছি ফলে যেখানেই যাই না কেন রাতে অবশ্যই ফিরতে হবে। পথে অম্বাদেবীর মন্দির দেখে মাউন্ট আবু দেখলাম। মনে হ'ল লাগেজ্ আনলে ভালই হ'ত, সবকিছু দেখে ফেরা যেত। লজে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। শরীর খুবই ক্লান্ত, আজও স্নান সেরে রাতের খাবার ঘরে আনিয়ে টিভি দেখতে দেখতে খাওয়া শেষ করলাম। বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে। গত দুদিন ডায়েরী লেখা হয়নি, আজ অন্তত না লিখে শুতে যাচ্ছি না। হাতে পেন নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

মাঝরাতে আবার সেই অস্বস্তি। আজও সেই মহিলা! কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইশারায় ডাকছে দেখে ভয়ে আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। মতলবটা কী ওনার? রোজ এভাবে কেন আসেন?

কোথায় জিজ্ঞাসা করব, তা না ভয়ে প্রায় ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ কানে এক অপূর্ব মিষ্টি স্বর ভেসে এল- 'আপনে মুঝে নেহি পেহ্চানা জী?' আমি উত্তর না দিয়ে খুব অবাক হয়ে তাকালাম- ভাবলাম আমি কোনদিনও তো দেখিনি এনাকে! তবে কী উনি এত অভিজাত হয়েও মিথ্যে বলছেন, না আমাকে ওনার চেনা বলে ভুল করছেন? কিছুই বুঝতে না পেরে বোবা হয়ে আছি। উত্তর না পেয়ে উনি আবার বললেন- 'হুকুম হামারে বারে মে আপকো কুছ ভী ইয়াদ নেহি? ইয়াদ কিজিয়ে জী একবার- শাদীকে দিন। হাম দোনো কভী একসাথ থে, কিসমতনে হাম দোনোকো অলগ কর রাখা থা, বহুত দিন হো গয়ে হোঙ্গে, ম্যায় সির্ফ আপকে লিয়ে ইধর ইস হাভেলী মে ইন্তজার কর রহা হুঁ। আপ আইয়ে, দেখ লিজিয়ে।' এবার আমি প্রতিবাদ করলাম- 'নেহি, আপ কিঁউ মুঝে পরেশান করতি, ম্যায় ব্যাচেলার হুঁ, আপকো জরুর কুছ গলদ হো গিয়া, ম্যায় এক সিধাসাধা বাঙ্গালী আদমী হুঁ, পহলিবার রাজস্থানমে আয়া।' বলামাত্রই মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে এক তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। মনে হ'ল আমার মাথার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মান্ড ঘুরছে। সামনে দেখি বিশাল বিয়ের শোভাযাত্রা। ঘোড়ায় টানা রথে সম্রাজ্ঞীর মতো এই মহিলা বসে আছেন। আমি চলেছি উষ্ণীষ পরে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে, সুসজ্জিত ঘোড়ার পিঠে। সূর্যের শেষ আলো ছুঁয়ে গেছে নব বধূর সাজসজ্জায়, ফলে দামী অলঙ্কারের জৌলুস আরও ঠিকরে পড়ছে। হঠাৎ কোথা থেকে সাদা ঘোড়ায় ধূলো উড়িয়ে মন্ত্রীপুত্র চমনলাল এসে কনেরূপী এই মহিলাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ছত্রভঙ্গ হ'ল শোভাযাত্রা। মন্ত্রীনন্দিনী আংটির বিষ মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। আমি ছোট রাজকুমার। সামনে থেকে সেনাপতির ছেলে আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে হরণ করল ও নব বধূর মৃত্যু - দুটি ঘটনার ফলে আমার শরীর নিস্তেজ, প্রাণহীন। নিমেষে চোখের সামনে এত ঘটনা ছায়াছবির মতো ঘটে যেতে থাকল। উত্তেজনায় আমি কাঁপছি। চিৎকার করে বললাম- 'থামান আপনার বুজরুকি। আমি এসব দেখতে চাই না।' বিষণ্ন বদনে উনি বললেন- 'অনেকদিন বাদে আপনাকে আমি পেয়েছি। এতদিন শুধু আপনার জন্যেই এখানে অপেক্ষা করছিলাম। আজ আর আমাকে ফেরাবেন না হুকুম---'

ভদ্রলোকের ডায়েরীতে এই পর্যন্তই লেখা আছে। পরদিন ঘর ছেড়ে দেবার কথা ছিল, কিন্তু বেরোচ্ছেন না দেখে লজের লোক পুলিশে খবর দেয়। পুলিশের এনকোয়্যারিতে দেখা গেল ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। ঘরে কেউ নেই, লাগেজ্পত্র সবই রাখা আছে। কলকাতায় ভদ্রলোকের আসল বাড়ি। নাম শ্রীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ তাঁর বাড়িতে খবর দেয়। বাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধব সকলে একসঙ্গে এসে হাজির হন। তাঁরা ডায়েরীতে লেখা ঘটনার কথা উড়িয়ে দিলেন। গোয়েন্দা মারফৎ তদন্ত শুরু হ'ল।

রাজস্থানের ইতিহাসে পাওয়া গেল ১৮৯৩ সালে দিলীপ সিং নামে মান্ডুর রাজার ছোট ছেলের সঙ্গে জয়পুরের মন্ত্রীর মেয়ে ঊর্মিলার বিয়ে হয়। তারপর হয় অঘটন- সেনাপতির ছোট ছেলে চমনলাল বিয়ের শোভাযাত্রা থেকে ঊর্মিলাকে হরণ করে, পরে ঊর্মিলা আত্মহত্যা করে। তদন্তকারী দল অবশেষে ক্ষান্ত হন। ডায়েরীতে লেখা ঘটনার সঙ্গে তদন্ত রিপোর্ট মিলে গেলেও শ্রীকান্তবাবুর কোন খবর তারা দিতে পারেননি।

·•●❖●•·

চলাচল
মালবিকা চ্যাটার্জী

অন্ধকারের অধর চুঁয়ে
যখন নামে আলো
কি জানি কী মন্ত্রবলে
সবই লাগে ভালো।

আকাশ ভরা সূর্য তারা
হর্ষেভরা প্রাণ
জীবনতরী আশায় ভরা
সকলই তোমার দান।

শিশুর হাসি বনের বাঁশি
শুদ্ধ করে মন
বিশ্বমায়ের আশিস্ নিয়ে
ভরব এ জীবন।

তাল-বেতালের মাঝখানেতে
ছন্দ রাখি ধরে
সুরের মাঝে বেসুর বেজে
গভীর ছায়া পড়ে।

কোন খেয়ালের স্বপ্ন দিয়ে
রচি এ ঘরবার
কল্পনাজাল বিছিয়ে মোরা
হই সে আঁধার পার।

পথ ভুলিয়ে কাঁদাও যারে
দাঁড়াও তারই পাশে
আবার যে সেই আশার আলো
চলার পথে আসে।

ভুবন জুড়ে এই যে খেলা
খেলাও তুমি প্রিয়
অস্তমিত ক্ষণে প্রভু
দরশ তব দিয়ো।

আবার যদি আসি ফিরে
এই এ ধরা'পরে,
ধন্য হব এই মাটিতে
নতুন জীবন গড়ে।

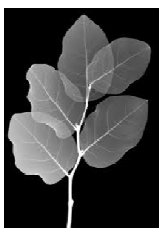

·•●❖●•·

ছবি

পুষ্পা সাক্সেনা
অনুবাদ: সুজয় দত্ত

অ্যাপার্টমেন্টের খিড়কি দরজা খুলতেই লোকদুটোকে আবার চোখে পড়ল। রোজ সকালে ঐ একই মেপ্‌ল্‌ গাছের তলায় দুই বুড়ো গুটিসুটি মেরে বসে থাকে। নিঃশব্দে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশের রাস্তার প্রাতঃকালীন ব্যস্ততার প্রতি এতটাই নির্লিপ্ত যে মনে হয় যেন শহরের ব্যস্ত সড়ক নয়, ঢেউহীন সমুদ্রের ধারে বসে আছে। এক আধবার নিজেদের মধ্যে হয়ত কথা বলতেও দেখেছি। চেহারায় সেই ভাবলেশহীনতা যা এখানকার বয়স্ক মানুষদের চেহারায় প্রায়শঃই দেখা যায়।

বিনীতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এরা কারা রে? রোজ দেখি এদের, গাছতলায় এইভাবেই চুপচাপ বসে-দাঁড়িয়ে থাকে।

- এরা হোমলেস, আন্টি। লোকের কাছে পয়সা চেয়ে এদের দিন চলে।

- সেকী! আমি তো ভেবেছিলাম আমেরিকায় ভিখারী নেই।

- এদেশেও গরীব লোক আছে, যাদের নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।

- কিন্তু আমি তো কোনোদিন ওদের কারো কাছে হাত পাততে দেখিনি। কাউকে এগিয়ে এসে ওদের পয়সা দিতেও দেখিনি। এরা তাহলে ভিখারী হয় কী করে?

- আরে, ওরা আমাদের দেশের মতো জোর গলায় ভিক্ষে চায় না। আস্তে করে জিজ্ঞেস করবে, 'হ্যাভ্‌ ইউ গট্‌ আ কোয়ার্টার?' মানে পঁচিশটা পয়সা হবে? কখনো আবার জিজ্ঞেস করে, আমরা ওদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি।

- আচ্ছা, আমি গিয়ে লোকদুটোর সঙ্গে একটু কথা বলব?

- না না, ওসব করতে যেও না। আমেরিকানরা তাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা এমনিতেই কাউকে বলতে চায় না, তার ওপর তোমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি বিদেশী, এখানে থাকো না। তাই আরোই বলবে না।

সাবধানবাণী শুনিয়ে কলেজে বেরিয়ে যায় বিনীত। আমার কৌতূহল তাতে বাড়ে বই কমে না। একদিন ও কলেজ চলে যাবার পর সাহস করে রাস্তা পার হয়ে আমি সেই মেপ্‌ল্‌ গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। জুনের মাঝামাঝি অ্যাল্‌বানিতে বেশ ভালই গরম পড়েছে। মেপ্‌লের ঠান্ডা ছায়ায় বেশ আরাম লাগছিল। নিজের মুখের ভাব যথাসম্ভব অবিচলিত রেখে দুই বুড়োকে অভিবাদন জানিয়ে প্রত্যুত্তরের আশায় ওদের মুখের দিকে চাইলাম। এক মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা নড়ে উঠল ওদের- কিছু না বলে মাথাটা একবার সম্ভ্রমসূচকভাবে নীচে ঝোঁকাল শুধু। বিনীতের বারণ আমার মনে আছে, কিন্তু এতটা যখন এসেই পড়েছি, প্রশ্ন না করে কি আর ফিরে যাওয়া যায়?

- আপনাদের রোজই দেখি এখানে। মনে হচ্ছে এখানকার পুরনো বাসিন্দা আপনারা।

- ইয়েস্‌। বলে আবার নৈঃশব্দে ডুব দেয় দুজনে। নিজেকে একটু অপ্রস্তুত লাগলেও কথা চালিয়ে যাই আমি।

- কেমন লাগে এখানে? মানে আমি বলতে চাইছি আপনাদের যৌবনও নিশ্চয়ই এখানে কেটেছে, আবার এই বয়সেও এখানেই আছেন। তখনকার সঙ্গে এখনকার তো অনেক তফাৎ, তাই না?

প্রশ্নটা করে সেই নির্বিকার চেহারাদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকি। আমার দিকে উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে একজন আস্তে আস্তে উঠে চলে যায়। অন্যজন আনমনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে অপমানিত বোধ করেও আমি আবার শুধাই-

- মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না!

এবার ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল, নির্বিকার গলায় সংক্ষিপ্ত উত্তর এল, 'কত বছর কারো সঙ্গে কথা বলিনি ম্যাম্‌। কথা বলাই ভুলে গেছি।'

- আমি ভারত থেকে এসেছি। ওদেশে আমরা মনে করি কথা বললে মন হালকা হয়। আমি একজন ট্যুরিস্ট। মাসখানেক আছি। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে কৌতূহল তো আছেই। আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনে সেটা খানিকটা মেটাতে চাই।

- এখানকার জীবন? ঐ যে রাস্তায় হুশ্‌ হুশ্‌ করে গাড়ী ছুটে যাচ্ছে, এটাই এখানকার জীবন।

- ঐ গাড়ীগুলোও তো কোথাও না কোথাও থামে। ওদেরও তো বিশ্রাম দরকার হয়, মেরামতি দরকার হয়।

- দৌড়তে দৌড়তে যখন ক্লান্তি আসে, বিশ্রাম না নিলে আর চলে না, সোজা স্ক্র্যাপ্‌ ইয়ার্ডে চালান করে দেওয়া হয় ম্যাম্‌।

- দেখুন, আপনার যখন একটু সময় হবে, সামনের ঐ অ্যাপার্টমেন্টে একবার আসতে পারবেন? আপনার সঙ্গে এক কাপ চা খেতে খেতে গল্প করব খানিকক্ষণ। দিনের বেলাটা বড্ড একা লাগে।

- আমি কোথাও যাই-টাই না।

চাবুকের মতো উত্তরটা দিয়েই হাঁটা লাগায় লোকটা। আমি অপমানটা হজম করে ফিরে আসি অ্যাপার্টমেন্টে। বিনীত ঠিকই বলেছিল। এদের সঙ্গে আলাপচারিতার চেষ্টা বোকামি।

পরের চার-পাঁচ দিন আমার নিউ ইয়র্ক ঘুরতে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। ফিরে আসার পরদিন সকালে আবার অভ্যাসবশতঃ রাস্তার উল্টোদিকে মেপ্‌ল গাছটার তলায় চোখ চলে গেল। সেদিনের সেই বৃদ্ধই তো- দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগে কী যেন রয়েছে। খিড়কির দরজা খুলতেই মনে হল লোকটা যেন চোখ তুলে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে তাকাল একবার। কী জানি, হয়ত আমার মনের ভুল। কারণ তারপরেই আবার দেখলাম চিরাচরিত উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সকালের চায়ের কাপে তৃপ্তির শেষ চুমুক দিয়ে ওটা বেসিনে নামিয়ে রাখতেই ডিং ডং করে কলিংবেল বেজে উঠল। কে রে বাবা! বিনীত তো একটু আগেই কলেজে বেরোল- এরমধ্যেই ফিরে এল নাকি? ইতস্ততঃ করে দরজা খুলতেই বিস্ময়! আরে- এতো সেই গাছতলার লোকটা! প্রসন্ন মুখে অভিবাদন জানিয়ে ওকে ভেতরে আসতে বললাম। ধীর, ক্লান্ত পায়ে এসে বসল ড্রইংরুমের একটা চেয়ারে। আমি চা আনতে কিচেনে গেলাম।

চায়ের সঙ্গে কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে ফিরে এসে দেখি লোকটা ড্রইংরুমের দেয়ালে টাঙানো তেলরঙের ছবিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে নিরীক্ষণ করছে। এখানে আসার সময় বিনীতের জন্য আমি নিজের হাতে কয়েকটা ছবি এঁকে এনেছিলাম। অন্যান্য পেন্টিং-এর সঙ্গে সেগুলোও সাজানো আছে দেওয়ালে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে ও ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে এঁকেছে এগুলো?'

- আমি।

- কোথাও শিখেছিলেন বুঝি?

- না না। ওগুলো এমনিই শখ করে আঁকা। পেন্টিং আমার হবি।

- ও, তাই? একটু প্র্যাক্টিস করলে ভালই আঁকতে পারবেন আপনি। হাতের স্ট্রোক তো ঠিকই আছে।

- আপনিও আঁকতে-টাকতে পারেন নাকি?

বিস্মিত হয়ে বলি আমি। উত্তরে এই প্রথম হাসতে দেখলাম লোকটাকে।

- হাঃ হাঃ হাঃ। ওটাই এককালে আমার জীবন ছিল ম্যাম্।

- তাহলে ছেড়ে দিলেন যে? এই হবিই তো আপনার নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে।

- হ্যাঁ, তা পারে। আবার অনেক সময় সঙ্গী ছিনিয়ে নিয়ে আরো নিঃসঙ্গ করে দিতেও পারে।

অদ্ভুত একটা উত্তর দিয়ে চায়ের কাপটা সাবধানে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে লোকটা চলে যাবার উপক্রম করছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার আঁকা ছবি দেখাবেন একদিন?'

- আমার ছবি? সেসব কোথায় হারিয়ে গেছে। আমার স্মৃতিতেও রাখিনি তাদের। দেখাব কী করে?

ধীরে ধীরে এই কথাকটি বলে বেরিয়ে যায় ও। আমার মন কেন জানি না বলতে থাকে, এ দেখাই শেষ দেখা নয়, আবার আসবে ও।

ঠিক তাই। পরদিনই আবার এসে হাজির- সেই একই সময়ে। কলিং বেল বাজতে দরজা খুলে ওকে দেখে খুশী হয়ে বললাম, 'আসুন, আজ আমি এখনো চা খাইনি, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

- চা খেতে আসিনি ম্যাম্। আপনার জন্য দুটো ব্রাশ এনেছি, এই নিন। এগুলো দিয়ে আমি আমার ছবিতে ফিনিশিং টাচ্ দিতাম। শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া দুটো পুরনো ব্রাশ আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে একবার হাতটা থমকাল, দৃষ্টিটা এক মুহূর্তের জন্য স্থির হল ব্রাশদুটোর ওপর, তারপর আমার মুখের দিকে। ওদুটো হাতে নিয়ে ঐ অজানা অচেনা বৃদ্ধের ওপর এক অদ্ভুত করুণামিশ্রিত সহানুভূতিতে ভরে উঠল আমার মন। বললাম, 'আমি খুব যত্ন করে রাখব এগুলো। আমার আঁকায় নতুন জৌলুস এনে দেবে আপনার এই ব্রাশ। অনেক ধন্যবাদ।'

- ঈশ্বর করুন, তাই যেন হয়।

- আচ্ছা, এবার আমাকে পোর্ট্রেট্ আঁকার টেক্‌নিক্ নিয়ে একটু বলবেন? ল্যান্ডস্কেপ্ই আমি বেশি আঁকি, কিন্তু পোর্ট্রেট্ আঁকতেও ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে।

- শুধু একটা কথাই বলব। ছবি আঁকবেন আঁকুন, কিন্তু ওগুলোকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবেন না।

- মানে? আপনার এই দর্শনটা ঠিক বুঝলাম না। আমি তো ছোটবেলা থেকে শিখেছি যে, শিল্পকলা- তা সে নাচ, গান, অভিনয়, ছবি-আঁকা যাই হোক না কেন- তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

- আমি ঠিক তাই করেছিলাম ম্যাম্। প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতাম আমার আঁকা ছবিগুলোকে। তাই আমার সৃষ্টিরাও হ'ত সেরকম অনুপম, অদ্বিতীয়। আমার সবসেরা যে ছবিটা, যেটা দেখে মনে মনে ভাবতাম পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু সৃষ্টি করা বোধহয় সম্ভব নয়, সে যেতে যেতে আমায় কী শিখিয়ে গেল জানেন?

- বলুন না। অনেক সময় আছে হাতে। আমি গল্পের গন্ধ পেয়ে নড়েচড়ে বসি। লোকটা আনমনে বলতে শুরু করে। অনেকটা যেন নিজেকেই বলছে, সেরকম নীচু স্বরে। সব কথা বুঝতে পারছিলাম না। মন দিয়ে শুনে যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

- আমি তখন পরিপূর্ণ যুবক। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। ছবি আঁকার নামে পাগল, ওতেই দিনরাত মগ্ন। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, সবই ধরে রাখতে চাই রংতুলি দিয়ে ক্যান্‌ভাসের বুকে। একদিন এক কলেজ-ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। আমার গুণমুগ্ধ সে। বলল, আমার ছবির মডেল হতে রাজী। আসলে আমি তখন এত আঁকতাম যে ছবিতে ছবিতে ঘর বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, নিজেরই থাকবার জায়গা ছিল না। বন্ধুরা জোর করে সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে হল ভাড়া করে সেই ছবিগুলোর একটা প্রদর্শনী করেছিল। সেই প্রদর্শনীতেই মেয়েটির সঙ্গে প্রথম দেখা। আমার প্রতিটা ছবি ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ওর সেই এক হাত কোমরে আর অন্য হাত চিবুকে রেখে নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চেহারাটায় এমন কিছু ছিল, যা আমার শিল্পী মনকে নাড়া দিয়ে গেল। ওর অজান্তেই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ওর একটা স্কেচ করে এক বন্ধুকে বললাম, যা তো, এটা গিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে আয়। হঠাৎ নিজের ছবি দেখে বিস্ময়ে পুলকে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল ওর মুখ। বলল, 'আমাকে সত্যিই এত সুন্দর দেখতে?' সেই বলার মধ্যে মিশেছিল একটা শিশুসুলভ কৌতূহল আর ঈষৎ লজ্জা। উত্তরে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তুমি এর হাজার গুণ বেশী সুন্দর। এ তো স্রেফ একটা স্কেচ। তোমার চোখেমুখে যে নৈসর্গিক দীপ্তি আছে সেটা রং-তুলি ছাড়া ফোটাব কী করে?' এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে ও বলল, 'তাহলে এই স্কেচ আমি নেব না। আমার রঙীন ছবি চাই।'

'বেশ তো, আমার মডেল হও। অনেকক্ষণ ধরে আমার সামনে বসে থাকো'। আমিও ঠাট্টা করে উত্তর দিলাম।

'কবে থেকে বসতে হবে? বলুন না! যত সময় চাই আমি দিতে রাজি। এক্ষুণিই দিতে পারি---'

'ঠিক আছে, কাল সকাল দশটায় এখানে চলে এসো।' কথাটা বলার সময় আমি বুঝিনি ও এটাকে আদৌ সিরিয়াস্‌লি নেবে কি না। কিন্তু আমাকে অবাক করে পরদিন ঠিক পৌনে দশটায় ও এসে হাজির। তার আগের রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম ঠিক কীভাবে কোন্ ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে ওকে বসিয়ে আঁকলে সবচেয়ে সুন্দর লাগবে। কিন্তু বাস্তবে ওকে চোখের সামনে দেখে সব গুলিয়ে গেল, শুধু বললাম, 'তোমার নিজের যেভাবে ভাল লাগে সেভাবে বোসো।'

ও কিভাবে বসল জানেন? আমার দিকে সোজা তাকিয়ে, মুখে একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের হাসি নিয়ে। সেই হাসিতে কেমন একটা চ্যালেঞ্জ ছিল- যেন মনে হ'ল বলছে, ক্যান্‌ভাস আর রংতুলি নিয়ে যতই চেষ্টা কর, আমার চেয়ে বেশী সৌন্দর্য্য ওখানে ফোটাতে পারবে না। ব্যাস, আমিও পাগলের মতো চেষ্টা শুরু করলাম চ্যালেঞ্জটা জিততে। কিন্তু সারাদিন নানারকমভাবে এঁকেও মন ভরল না। ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম। ও কিন্তু তখনো সেই অবিচলিতভাবে হাসিমুখে বসে আছে। হেরে গেলাম আমি। ও চলে যাবার পরেও ওর সেই বিজয়িনী মূর্তি আমার মানসপটে আঁকা হয়ে রইল। সেদিন সারারাত ক্যান্‌ভাসে তুলি চালিয়েছিলাম বোধহয়। সকালে ও-ই এসে জাগাল আমায়- চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। আমার রাতে আঁকা ছবিটা ওর হাতে ধরা। বলল, 'আমি সত্যিই এমন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী বলতে চাও? এ-ছবিতে তুমি তোমার কল্পনার রং মেশাওনি তো?'

সেই যে শুরু, তারপর দুজনে ভেসে চললাম আমরা। ও হয়ে গেল আমার ছবির একমাত্র নায়িকা। কখনো ওর ঝর্ণায় চান করার ছবি, কখনো ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আভায় মাখামাখি ওর উদাস মুখ, কখনো বা একরাশ ফুল আর লতাপাতার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে ও। একটা ছবিতে আবার উইলো-গাছের নুয়ে পড়া ডাল থেকে ও ঝুলছে। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে ওকে যখন কাছে ডেকে নিতাম 'টিনা' বলে- ওহো, বলা হয়নি, ওর নাম টিনা- ঠোঁটে রামধনু-রং মাখা স্বপ্নিল হাসি ঝুলিয়ে ছুটে আসত ও।

প্রথম যখন ওর একটা ছবি নিউইয়র্কের এক নামকরা পত্রিকায় ছাপল, আমি যে কত প্রশংসাসূচক চিঠি পেয়েছিলাম কী বলব! অবশ্য সেই প্রশংসা আমার আঁকার হাতের না ওর দেহসৌন্দর্য্যের- তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে। কেউ কেউ ওর ঠিকানা জানতে চাইল, কেউ আবার বড় বড় সব শিল্পীর কাছে ওকে মডেল হওয়ার প্রস্তাব দিল। সব দেখেশুনে তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম- এইসব লোকের পাল্লায় পড়ে আমার টিনা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না তো? প্রদর্শনী আর পত্র-পত্রিকায় আমার আঁকা ওর কোনো ছবি পাঠানো বন্ধ করে দিলাম। টিনা নিজে যদিও এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাত না। আমার শিল্পের উৎকর্ষের জন্য ও নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে দিয়েছিল। তবু, ওকে কেউ আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, এই ভয় সদাসর্বদা আমাকে তাড়া করে ফিরত। ওকে ছাড়া আমার জীবন আমি ভাবতেই পারতাম না। শেষমেষ একদিন ওকে করেই ফেললাম প্রশ্নটা- 'আমার জীবনসঙ্গিনী হয়ে চিরকাল আমার পাশে থাকতে চাও?' উত্তরে ও নিজেকে আমার বুকে সঁপে দিয়ে বলেছিল, 'ওঃ স্টীভ্, কতদিন ধরে এই মুহূর্তটার প্রতীক্ষা করে আছি তুমি জান? আই লাভ্ ইউ, স্টীভ্!'

কিন্তু বিয়ের জন্য টিনা ওর বাবার স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি পেল না। ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে, আদরে মানুষ। এক সাধারণ শিল্পীর সঙ্গে ঘর বেঁধে জীবনটা নষ্ট করুক ও, সেটা উনি চাননি। তাই ওঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমরা বিয়ে করলাম। বিয়ের পর বাবার বাড়ীর সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক তো ছিলই না, ওঁর নামও খুব একটা মুখে আনত না ও। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে বলত, 'আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার নড়চড় হবে না। একটা সম্পর্ক ছিঁড়ে আর একটা জুড়লাম। বাবা তোমাকে স্বীকার করে নিতে রাজি হল না যখন, বাবার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ছাড়া আমারও উপায় ছিল না। বাবা আমার জেদ ভালরকম জানে, তাই আর কখনও আমার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, স্টীভ্।' ওর এই কথা থেকেই ওর চরিত্র বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়- বাইরে থেকে দেখে ওকে উইলো-লতার মতো কোমল আর নমনীয় মনে হলেও ভেতরে ভেতরে ও ছিল পাথরের মতো দৃঢ়, কেউ ওকে টলাতে পারত না। ওকে পেয়ে মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়। আমার জীবন, আমার সংসার পরিপূর্ণ করে তুলেছিল ও। না জানি কত অসংখ্য ক্যান্‌ভাসে ওর রূপ ধরে রাখার চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু কখনো মনে হয়নি পুরোপুরি পেরেছি। খালি মনে হয়েছে এখনো কিছুটা বাকী রয়ে গেল।

ও ছাড়াও আরেকজন ছিল আমার জীবনে, যার ওপর আমি একান্তভাবে নির্ভর করতাম। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জন্। ও শুরু থেকেই আমার আঁকা টিনার ছবির একজন মুগ্ধ দর্শক ছিল। মাঝে মাঝে আমাকে বলত, 'প্রদর্শনীতে টিনার ছবি না দেওয়াটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে স্টীভ্। শিল্পী হিসেবে তোমার আসল পরিচয় তো ঐ ছবিগুলোতেই।' কিন্তু ওর এই কথায় আমি বিশেষ পাত্তা দিতাম না। কারণটা আগেই বলেছি। টিনার কিছু ন্যুড্ ছবিও ছিল, যা আমি পরের দিকে এঁকেছিলাম। সেগুলো আমাদের বেড্‌রুম আলো করে থাকত। একবছর বাদে আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হল। সেই একরত্তি মেয়েটা আমাদের পবিত্র প্রেমের প্রতীক- যেন এক অনন্যসুন্দর, অপূর্ব, অদ্বিতীয় কলাসৃষ্টি। এমন ফুলের মতো নরম যে স্পর্শ করলে গায়ে কাঁটা দিত। আমরা ওর নাম রেখেছিলাম অ্যাঞ্জেলিনা। একদম গ্রীক দেবীর মতো পবিত্র আর সুন্দর ছিল ও।

অ্যাঞ্জেলিনাকে পেয়ে মনে হ'ল আমার সারাজীবনের সৃষ্টিকর্মের সাধনা অবশেষে সার্থক হ'ল। আমি আমার আঁকা ছবিগুলোয় যতই প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করি না কেন, দিনের শেষে ওগুলো নির্জীবই। অ্যাঞ্জেলিনা আমার সজীব, প্রাণবন্ত সৃষ্টি। একথা ভেবে গর্বে ভরে উঠত আমার বুক। প্রথম যেদিন অ্যাঞ্জেলিনাকে ফুটিয়ে তুললাম ক্যানভাসে, টিনাকে বললাম, 'আজ আমার শিল্পীজীবন সত্যি-সত্যিই সার্থক। এমন অসম্ভব সুন্দর ছবি এর আগে কখনো এঁকেছি কি? মনে পড়ে না।' মনে হল কথাটা শুনে এক মুহূর্তের জন্য টিনার উজ্জ্বল মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেল। অবশ্য ওটা আমার চোখের ভুলও হতে পারে। সেই ভেবে আমি আর ঐ ব্যাপারটায় অত গুরুত্ব দিলাম না।

আমার মেয়ের ছবি আমি পত্র-পত্রিকায় পাঠানো শুরু করলাম অল্পদিনের মধ্যেই। টিনার বেলায় যেমন হয়েছিল, এক্ষেত্রেও সেরকম ভুরি ভুরি প্রশংসা পেতে লাগলাম। ছবিগুলোর চাহিদা আর দাম দিন দিন বাড়তে লাগল। আমি নাওয়া খাওয়া ভুলে রাতদিন শুধু এঁকে চলেছি। অ্যাঞ্জেলিনার প্রতিটা ভঙ্গী ক্যান্‌ভাসে ধরে রাখতে আমি তখন বদ্ধপরিকর। ওর দেবশিশুর মতো ফুটফুটে নিষ্পাপ চেহারা, সদ্য-ফোটা গোলাপের মতো মিষ্টি হাসি, রাজহংসীর মতো চলাফেরা- সব অত্যন্ত সাবলীলভাবে রং-

তুলিতে ফুটিয়ে তুলছি আমি। এত ব্যস্ততার মধ্যে টিনাকে কি একটু ভুলে ছিলাম কিছুদিন? হবেও বা।

একদিন একটা আর্ট ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমার আঁকা ওর কয়েকটা অপ্রকাশিত ছবি দেখিয়ে টিনা বলল, 'তুমি বোধহয় ভুলেই গেছ স্টীভ্ যে এককালে আমি তোমার মডেল হলে তুমি ধন্য হয়ে যেতে। সেই সময়কার কিছু ছবি তোমার বন্ধু জন্ আমার অনুমতি নিয়ে এই পত্রিকায় পাঠিয়েছিল। ছবিগুলো ছাপার জন্য প্রচুর টাকা দিয়েছে ওরা। তোমাকে আগে বলিনি, ভাবলাম পত্রিকাটা হাতে এলে চমকে দেব।'

কী! আমার প্রাণের বন্ধু জন্ আমার বৌয়ের ছবি আমাকে লুকিয়ে ম্যাগাজিনে পাঠিয়েছে! চড়াৎ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। রুষ্টস্বরে বললাম, 'ছবিগুলো তোমার, ওগুলোর ওপর তোমার অধিকার হয়ত আছে, কিন্তু প্রকাশক বা অন্য কোনো বাইরের লোককে ওগুলো পাঠানোর অধিকার তো কখনো দিইনি। ছবিগুলো আমার আঁকা, আমার মেহনতের ফসল। আমাকে না জানিয়ে এটা করা ঠিক হয়নি।'

'কয়েকটা কম্পানী বেশ কিছুদিন ধরে মডেলিংয়ের জন্য সাধাসাধি করছে। স্টীভ, তুমি যদি হ্যাঁ বল, তাহলে---'

'অসম্ভব! বলছ কী করে কথাটা? তুমি না আমার স্ত্রী? ওসব আমার একদম পছন্দ নয়। মনে থাকে যেন।'

'ও, আমি তাহলে তোমার বন্দিনী ক্রীতদাসী? শিকলে বেঁধে রেখে দেবে আমায়?' আক্রোশ ঝরে পড়ে টিনার গলায়। আমি শান্ত থাকার চেষ্টা করি।

পরে একদিন চা খেতে খেতে জনের সামনে কথাটা তুলল টিনা, অভিযোগ জানাল আমার বিরুদ্ধে। জন্ ওর পক্ষ নিয়ে আমাকে বলল, 'এত সুন্দর সব ছবি কেবল নিজের সম্পত্তি করে রেখে দিয়ে তুমি সমাজকেই বঞ্চিত করছ স্টীভ্। আমি বলি কি, তুমি শুধু টিনার ছবিগুলো নিয়েই একটা প্রদর্শনী কর।' কথাটা শুনে খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠল টিনা, 'যাঃ, সত্যি বলছ জন্? আমি একা একটা গোটা প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু হতে পারি?'

'কেন নয়? দেখ না, ঐ প্রদর্শনীর পর স্টীভ্ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের সম্মান পাবে, আর তুমি মডেলিং জগতের রাণী হয়ে যাবে।'

ওদের সব উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে আমি বললাম, 'কেন আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ? জানো তো আমার এতে মত নেই।'

'কিসের আপত্তি তোমার?' জন্ জিদ ধরল, 'ভেবে দেখ, তোমারই সৃষ্টিকর্ম লোকের চোখে সম্মান পাবে। আর একজন শিল্পীর ক্যান্ভাসে যার ছবি আঁকা হয়, সে সেই শিল্পীর মডেল ছাড়া আর কিছু নয়- তার পত্নী, প্রেয়সী ইত্যাদি আর কোনো পরিচয়ই নেই।'

ওরা শুরু করল প্রদর্শনীর আয়োজন। আমার একদমই উৎসাহ লাগছিল না। মনে হচ্ছিল নিজের ব্যক্তিগত জীবন পাব্লিকের সামনে উন্মুক্ত করে দিচ্ছি। নেহাৎ ওরা দুজন অত পীড়াপীড়ি করল, তাই অনুমতি দিলাম।

টিনার দিনের বেশীরভাগটাই কাটত জনের সঙ্গে প্রদর্শনীর প্রস্তুতি-সংক্রান্ত কাজকর্মে। আমি ওদের কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকতাম, নিজেকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখতাম। দিনকয়েক পরে প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় এসে গেল। শিল্পী যখন আমি, উদ্বোধনে তো না গিয়ে উপায় নেই। টিনা আমার জন্য একটা নতুন স্যুট্ কিনল। তার সঙ্গে ম্যাচ্ করা টাই আর শার্টও ও-ই পছন্দ করে কিনল। প্রদর্শনীর ব্যাপারে ওর এই অতিরিক্ত উৎসাহ আমাকে কেমন যেন ঈর্ষান্বিত করে তুলছিল। মেয়েটা কি সত্যিই আমার শিল্পনৈপুণ্য প্রচার করতে চাইছে, না জনসমক্ষে নিজের অনন্য সুন্দর রূপ তুলে ধরে প্রশংসা কুড়িয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে, ও আমার মডেল না হলে আমার কী দশা হত! ও অবশ্য বারবার বলছিল, 'এই প্রদর্শনী সফল হলে তোমাকে আর পায় কে, স্টীভ্! আমার শরীরকেই তুমি শুধু আঁকনি, আমার মনের নানা ভাবকেও তুমি তোমার তুলির জাদুতে ফুটিয়ে তুলেছ। আমার মন বলছে তুমি দুহাত ভরে অর্থ, যশ, স্বীকৃতি- সবই পাবে।'

জন্ প্রচুর পরিশ্রম করে খুব চমৎকার আয়োজন করেছিল সবকিছুর। উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণও করা হয়েছিল। আর হলঘর-ভর্তি সেইসব ছবির স্রষ্টা-হিসেবে আমি ছিলাম বিশেষ অতিথি, অনেকে এসে আলাপ করল, কেউ কেউ অটোগ্রাফও চাইল। উষ্ণ গোলাপী রঙের পোশাকে টিনাকে লাগছিল ডানাকাটা পরীর মতো, ওকে ঘিরে সারাক্ষণ একটা ছোটখাটো ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যমণি হয়ে ও যেন গোলাপের মতো ফুটে রইল সারাক্ষণ। দু-একবার আমার কাছে এসে কানে কানে ফিসফিস করে বলে গেল, 'ইট্স্ গোয়িং টু বি এ গ্র্যান্ড সাক্সেস্, স্টীভ্! কী, আমি বলেছিলাম না?'

সেদিন ঐ হলঘরে দাঁড়িয়ে এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না যে, 'গ্র্যান্ড সাক্সেস' যদি হয়েও থাকে সেটা আমার গুণে নয়, আমার মডেলের গুণে। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চোখ পড়ল হলঘরের একেবারে পিছনের দেওয়ালে। আরেঃ, এতো আমাদের বেড্রুমের সেই ন্যুড্ ছবিগুলো! তার সামনে জড়ো হয়েছে একদল ছেলেছোকরা- হাঁ করে ছবিগুলো গিলছে আর মুচকি হেসে অপমানজনক টিপ্পনী কাটছে। আচ্ছা, জন্ কি এই একান্ত গোপনীয় ছবিগুলো বাদ দিয়ে প্রদর্শনীটা করতে পারত না? ছবিগুলোর নীচে আবার কায়দা করে ক্যাপ্শন দেওয়া- 'প্রিস্টিন বিউটি', 'ভার্জিন বিউটি', 'রেন্বো ড্রিম্স্', 'আন্টাচ্ড্'। এসব কার মাথা থেকে বেরিয়েছে? ক্রমশঃ উপলব্ধি করলাম, আসলে টিনাকে মডেলিং জগতে প্রতিষ্ঠিত করার সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রদর্শনী করা। উদাসীনতা দেখাতে গিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজনের খুঁটিনাটি দিকগুলো আমি পুরোপুরি ওদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। নাহলে আমার স্ত্রীর ন্যুড্ ছবি টাঙিয়ে আমাকে এভাবে অপমান করার অনুমতি দিতাম না। আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। ভিড়ের মধ্যে থেকে টিনাকে বাইরে টেনে আনলাম। থমথমে গলায় জানতে চাইলাম, 'ঐ ছবিগুলো এখানে এনেছ কেন? জবাব দাও।'

'কেন, ওগুলোই তো আমার সেরা ছবি। জানো, ওগুলো দেখে এ-দেশের পাঁচ-পাঁচটা বিজ্ঞাপন কোম্পানী ইতিমধ্যেই আমাকে মডেলিং-এর বরাত দিয়েছে? একটু আধটু ন্যুড্ মডেলিং তো করতে হতেই পারে।'

'তুমি- তুমি ন্যুড্ মডেলিং করবে? সবার সামনে নিজেকে নিরাবরণ করে দেবে? ঐ ছবিগুলোর মতো?'

'করলে ক্ষতি কী? সৌন্দর্য তো সকলের উপভোগ করার জন্য, ঘরে তালাবন্ধ করে রাখার জিনিস নয়। তাছাড়া টাকাপয়সার দিকটাও তো দেখতে হবে। আমি ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, মাই ডিয়ার।' টিনা ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার অন্তরের জ্বলন তাতে দ্বিগুণ বেড়ে যায়। চীৎকার করে বলি,

'তুমি আমার বউ, আমার! আমজনতার ভোগ্যবস্তু নও। সেটা ভুলে যাচ্ছ?'

টিনা একটু হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে ধীর গলায় বলল, 'এখানে সীন্ ক্রিয়েট কোরো না। যা বলার বাড়িতে গিয়ে বোলো। তুমি তো একদম মধ্যযুগের পুরুষদের মতো কথা বলছ। অত পজেসিভ্ হয়ো না ডিয়ার।'

'সোজাসুজিই বল না, তুমি আমার পরিশ্রমের ফসলকে কাজে লাগিয়ে নিজের জন্য নতুন রাস্তা খুলতে চাইছ। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ- আমি যদি তোমার ছবি না আঁকতাম, তোমাকে এত ইম্পর্টেন্স না দিতাম, তোমাকে আজ চিনত কে?' প্রচন্ড রাগে ভালমন্দ ভুলে গিয়ে আমি চেঁচাতে থাকি।

'নাঃ, আজ বুঝতে পারছি বিনা পয়সায় তোমার মডেল হয়ে ভুল করেছিলাম। সেদিন যদি চড়া দাম চাইতাম, আজ আমার কদর বুঝতে। কেন এঁকেছিলে ঐসব ছবি- নিজের স্বার্থপূরণের জন্যই তো?' টিনাও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। আমার ভেতরে আগুন তো জ্বলছিলই, ওর এই কথাটা তাতে এক টন ঘি ঢেলে দিল। শালীনতার সব সীমা ছাড়িয়ে আমি পকেটে যা টাকা ছিল বার করে ওর গায়ে ছুঁড়ে বললাম,

'এই নে তোর পয়সা! আর কত চাস বল! আমি স্বার্থপর? আমি এক্সপ্লয়েট্ করেছি তোকে? নে, যা নিবি নে---'

পাগলের মতো হলের ভেতর ছুটে গিয়ে আমি ওর ছবিগুলো ছিঁড়তে শুরু করি। জন্ বাধা দিতে এগিয়ে এলে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিই ওকে। আমার এই কান্ড দেখে ঘাবড়ে গিয়ে হলের ভেতরের লোকজন দ্রুত কেটে পড়তে থাকে। লজ্জিত, অপমানিত টিনা আমার দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে একছুটে হলের বাইরে চলে যায়। হলে রয়ে যাই শুধু আমি আর জন্। প্রদর্শনীর সবকটা ছবি একে একে ছিঁড়ে তবে আমার শান্তি হয়। আর জন্ সেই টুকরো টুকরো কাগজ আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক্যান্ভাসগুলো জড়ো করে জোড়া লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে।

সে-রাতে অনেকক্ষণ এই রাস্তায় সেই রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম- বাড়ি ফেরার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। হঠাৎ অ্যাঞ্জেলিনার কথা মনে পড়ল। মাথাটা একটু ঠান্ডা হওয়ার পর বুঝতে পারছিলাম আমি বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। আমার অনেক সংযত হওয়া উচিত ছিল। আসলে টিনার নিরাবরণ ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ঐ ছোঁড়াগুলো যে টিটকিরি দিচ্ছিল, তাতেই মাথাটা গরম হয়ে যায়। নিজের কীর্তিকলাপের স্বপক্ষে যুক্তি খোঁজার সঙ্গে সঙ্গে এও ভাববার চেষ্টা করছিলাম যে টিনার কাছে কীভাবে ক্ষমা চাইব।

তার আর দরকার হল না। ঘরে যখন ফিরলাম সেদিন, কেউ ছিল না সেখানে। শুধু অ্যাঞ্জেলিনার বেবি-সিটার মেরী অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। সে বলল, 'ম্যাডাম্ বেবীকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গেছেন। আপনার টেবিলের ওপর বোধহয় মেসেজ্ রাখা আছে।'

টেবিলের ওপর টিনার সুন্দর হাতের লেখায় একটা চিঠি। 'নিজেকে শিল্পী বলার দম্ভ আছে তোমার, কিন্তু আসলে তুমি একটা নীচ, স্বার্থপর, ছোটমনের লোক যার মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। আসল শিল্পী তো নিজের কলাসৃষ্টি সকলের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে ভয় পায় না, তার ক্ষতি করার কথা ভাবতেও পারে না। আর তোমার কাছে তোমার সৃষ্টি হল ঘরবন্দী সম্পত্তি, তাকে ধ্বংস করে দিতেও হাত কাঁপে না তোমার। যাই হোক, আমি চললাম। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তোমার সাধের জীবন্ত 'শিল্পসৃষ্টি'কেও, যে জন্মাতে না জন্মাতেই তাকে তুমি মডেল বানিয়েছিলে। আসলে ও তোমার সৃষ্টি নয়, আমার। যে শিল্পীর প্রতি এককালে আমার দুর্বলতা ছিল, যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম, ও ছিল সেই শিল্পীকে আমার দেওয়া উপহার। সেই উপহার আজ আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমার ভালবাসার সেই শিল্পী মরে গেছে। ওকে পৃথিবীতে আনার ব্যাপারে তোমার যাবতীয় ভূমিকা আমি অস্বীকার করি। আমায় খোঁজার চেষ্টা করে লাভ নেই। এবার থেকে তুমি তোমার 'শিল্পসাধনা' শুধু নিজের জন্যই কোরো। বিদায়।'

সেই দিন থেকে আজ অবধি আমি ঐখানে, ঐ মেপল্ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রোজ ওকে খুঁজি। ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সেই প্রথম দিনগুলোতে এই গাছতলাতেই তো রোজ দুপুরে আমাদের দেখা হ'ত। আর ঐ যে আপনাদের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের পিছনে বড় পার্কিং লটটা দেখছেন, ওখানে বহুদিন আগে একটা এক্সিবিট্ হল ছিল। সেই হলেই তো হয়েছিল সে-রাতের অভিশপ্ত প্রদর্শনী। আমার আদরের অ্যাঞ্জেলিনা আজ নিশ্চয়ই পূর্ণ যুবতী। এখান দিয়ে সারাদিন যেকটা বাচ্চা মেয়ে যেতে দেখি, সবার মধ্যেই যেন অ্যাঞ্জেলিনাকে দেখতে পাই। যেকটা সুখী দম্পতি এখান দিয়ে হাত ধরাধরি করে যায়, সবার মধ্যেই যেন আমার আর টিনার অতীতকে দেখতে পাই। আমার এই অন্তহীন খোঁজের শরিক আমার বন্ধু জন্ও। সেদিন গাছতলায় আমার সঙ্গে আরো একজন বসেছিল না? ও হচ্ছে জন্। ওরও খুঁজে খুঁজেই জীবন গেল। আসলে আমার সঙ্গে টিনার গন্ডগোল আর বিচ্ছেদের জন্য ও মনে মনে নিজেকে দায়ী করে। প্রদর্শনী করার প্রস্তাব তো ও-ই দিয়েছিল, না? যাকগে, এখন তো জীবনের সায়াহ্ন এসে গেছে আমার। কে জানে টিনা এখনো বেঁচে আছে কিনা।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলার পর স্টীভ্ চায়ের কাপে তলানি চা খুঁজতে থাকে। গলা শুকিয়ে গেছে বোধহয়। ওকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি এরপর কখনো টিনা বা অ্যাঞ্জেলিনার ছবি পত্র-পত্রিকায় দেখেননি? হতেই পারে যে টিনা মডেলিং চালিয়ে গেছিল।'

'না ম্যাম্। আমাদের রাগারাগি বা ছাড়াছাড়ি হলেও আমি তো ওকে চিনি। ও আমাকে ভেতরে ভেতরে এখনও কতটা ভালবাসে, আন্দাজ করতে পারি- মানে যদি এখনও বেঁচে থাকে আরকি। ও আর কখনো মডেলিং করেনি, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ও জানত যে ওতে আমার মত ছিল না। ও অভিমানী মেয়ে, স্বাধীনচেতাও বটে। জোর-জবরদস্তি করে ওকে দিয়ে কখনো কিছু করানো যেত না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও ঐ কাজ করবে না।'

‘এখনও এত ভালবাসা, এত পারস্পরিক বিশ্বাস- ভাবলে কষ্ট লাগে যে আপনাদের আর কখনো দেখাই হ’ল না।’
‘টিনা বরাবরই ঐরকম। যে জিনিস একবার ত্যাগ করেছে, তাকে এ জীবনে আর দ্বিতীয়বার গ্রহণ করবে না। ঐটাই ওর যত সমস্যার কারণ, আবার ঐটাই ওর শক্তি। আমাকে ছেড়ে যখন গেছে, চিরকালের মতো সবকিছু শেষ করে দিয়েই গেছে।’

গল্প শেষ করে বিদায় নিল স্টীভ্। খিড়কির দরজা দিয়ে দেখলাম ও আর জন্ ধীর পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে দূর থেকে আরো দূরে- আমার দৃষ্টিপথের বাইরে। আমার মনের ভেতর একটা কাঁটা বিঁধে থাকে, যন্ত্রণা ছড়াতে থাকে। হাতদুটো জড়ো করে বলি, হে ভগবান, একটিবার- শুধু একটিবার টিনাকে ফিরিয়ে আনো ওদের কাছে। কলিংবেলের শব্দে চমক ভাঙে। বিনীত এসে গেছে বোধহয়।

হিমালয় পর্বতমালা

এভারেস্ট 8,848 m (29,029 ft)

কাঞ্চনজঙ্ঘা 8,586 m (28,169 ft)

অন্নপূর্ণা 8,091 m (26,538 ft)

কৈলাস 6,638 m (21,778 ft)

Leonardo da Vinci - Virgen de las Rocas (Museo del Louvre, c. 1480)

199 × 122 cm (78.3 × 48 in)

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

১৪২০ (2013)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা অথবা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক, তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি পাঠান নিম্নলিখিত ঠিকানায়।
যদি আপনারা টাইপ করে লেখা পাঠাতে চান, তাহলে 'আমার বাংলা' ফন্ট ব্যবহার করুন।
আমার বাংলা ফন্টে টাইপ করা লেখা ওয়ার্ড বা বাংলা ওয়ার্ড ফরম্যাটে পাঠান (পিডিএফ্ নয়)।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479

e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321

e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২০ ডলার।
বর্তমানে প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা সাহিত্যের বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে,
যেগুলি সভ্যরা পছন্দমত ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401

Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com